

ছোটদের

বইয়ের

স্বপ্নরাজ্য



শৈব্যা প্রকাশন বিভাগের নতুন ঠিকানা
৫৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯

4.8

৯২০

চিকানা দেব

ছেলবেলা

চরিত্রবস্তু সঙ্গ্রহাদিত

চিকানা দেব ছেলবেলা. সঙ্গ্রহাদিত

Code no 4.8

SL no 53

Reprint. In the Press.

৭৫৪

হেলোবেল গল্প



আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

‘১৮৭০ খৃস্টাব্দে আমি প্রথম কলিকাতায় আসি। আমার পিতা বামাপুকুর লেন এবং রাজা দিগম্বর মিত্রের বাড়ির বিপরীত দিকে বাড়ি নেন। আমরা এই বাড়িতে প্রায় দশ বৎসরকাল বাস করিয়াছিলাম। আমার বাল্যকালের সমস্ত স্মৃতিই ঐ বাড়ি এবং চাঁপাতলা নামে পরিচিত শহরের ঐ অঞ্চলের সঙ্গে জড়িত।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আছি ব্রাহ্ম সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেশবচন্দ্র সেন তখন সবেমাত্র তাঁহার নূতন ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পিতার বাসা ঐ সমাজের খুব নিকটে ছিল।...আমি আগস্ট মাস মহানন্দে কলিকাতায় কাটাইলাম এবং প্রায় প্রতিদিনই নূতন নূতন দৃশ্য দেখিতাম।

...আমার পিতা আমাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে হেয়ার স্কুলে ভর্তি করিয়া দিয়াছিলেন। হেয়ার স্কুল তখন ভবানীচরণ দত্ত লেনের সম্মুখে একটি একতল বাড়িতে অবস্থিত ছিল।...আমার সহাধ্যায়ীরা যখন জানিতে পারিল যে, আমি যশোর হইতে আসিয়াছি তখন আমি তাহাদের বিক্রম ও পরিহাসের পাত্র হইয়া উঠিলাম। আমাকে তাহারা ‘বাঙাল’ নাম দিল।...তখনকার দিনে জাতীয় জাগরণ বলিয়া কিছুই নাই। সুতরাং অল্প লোকেই জানিত যে আমার জেলা দুইজন মহাযোদ্ধাকে জন্ম ও আশ্রয় দিয়াছে—যাঁহারা মোগল বাদশাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। বাংলার তদানীন্তন সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিত কবি অমিত্রাক্ষর ছন্দে ব্রহ্মদাতা আমাদেরই গ্রামের দৌহিত্র সন্তান এবং তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র যশোরেই জন্ম গ্রহণ করেন।...হেয়ার স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে আমাদের প্রধান শিক্ষক ছিলেন চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার বিশাল বলিষ্ঠ দেহ, ঘন গুচ্ছ এবং মুখাকৃতির ভিত্তি তাঁহাকে বাঘের মত দেখাইত। সেইজন্য আমরা তাঁহার নাম দিয়াছিলাম ‘বাঘাচণ্ডী’। পঞ্চাশত্রে, অ্যালবার্ট স্কুলে আমাদের শিক্ষকেরা শান্ত ও মধুর প্রকৃতির ছিলেন কৃষ্ণবিহারী সেন স্কুলের রেকটর ছিলেন। তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন—ইংরেজি সাহিত্যে তাঁহার প্রগাঢ় অধিকার ছিল। তাঁহার শিক্ষকতায় ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পাইল...আমি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলাম। আমার শিক্ষকদের আমার সম্বন্ধে খুব উচ্চ আশা ছিল। তাঁহার আমার পরীক্ষার ফল দেখিয়া একটু নিরাশ হইলেন। বৃত্তিপ্রাপ্তদের তালিকায় আমার নাম ছিল না।

ছাত্রজীবনের এই সময়ে আমি সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ সংযত করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। আমি সাহিত্যের মায়া ত্যাগ করিয়া বিজ্ঞানেরই অন্বেষণে স্বীকার করিলাম এবং বিজ্ঞান নিঃসংশয় একনিঃসেবককেই চাহিল।”

Acc. no. 15000

প্রকৃতি বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র



মুখ্য শ্রী পাত্র

অনেক দিন আগেকার কথা :

একবার বর্ষাকালে আজকের বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার লোনসিং নামে এক গাঁয়ে ঘটেছিল এক অমৃত ঘটনা। গ্রামের প্রান্তে ছিল বহুদিনের পরিত্যক্ত এক পোড়ো ভিটে। বর্ষাকালে রাতে বর্ষা নামলেই শব্দ হত আলোর নাচন। সে আলো প্রদীপের স্বর্ণাভ শিখার মত নয়, কাঠ কয়লার আগুনের মত লাল গনগনেও নয়, লক্ষ জেনাকির প্রভার মত নীলাভ দ্যুতিসম্পন্ন আশ্চর্য কতকগুলো আলোর সমাবেশ।

আলোগুলো আবার স্থির হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকত না। কখনও থর থর করে কাপতো, কখনও কয়েকটাকে একত্রে ছুটে যাওয়ার মত মনে হত, আবার কখনও সবগুলো একসঙ্গে নিভে যেত। গাঁয়ের লোকেরা ধরে নিল, পরিত্যক্ত এই ভিটেতে অশরীরী প্রেতাঙ্গাদের আগমন হয়েছে। আকাশ থেকে টপটাপ বৃষ্টি বরষে শব্দ করলে তারা আলো জ্বলে খেলাধুলার মেতে ওঠে। রাতিতে তো দূরের কথা, দিনের বেলায়ও কেউ সেই ভিটের ত্রিসীমানায় ভিড়ত না।

সেই গাঁয়ে রাস করতেন সৎকারমুগ্ধ এক তরুণ। অনুসন্ধিৎসু তার মন, প্রখর বুদ্ধি এবং ভয়লেশহীন মন।

একদিন বন্ধুদের বললেন ‘পাচীর মাগের’ ভিটের ঐ আলোটার প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন না করলে নয়। সবাই মিলে একবার যাই চল সেখানে!

কথাটা শোনা মাত্রই বন্ধুরা আঁকে উঠল। বলল—কি দরকার ভাই! জেনে শব্দে ভুতের পাল্লায় পড়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

তরুণটি কিন্তু সহজে হাল ছেড়ে দিলেন না। অনেক করে বোঝালেন বন্ধুদের। শেষে মাত্র দু-জন বন্ধু সম্মত হল তার সদ্বী হতে।

নিশ্চুতি রাত। মাথার ওপর টিপটিপ করে ঝরছে বৃষ্টি। চারদিকে পোকামাকড়ের রিনঝিন শব্দ, ব্যাঙের গ্যাঙর গ্যাঙর ডাক, পেঁচার ককশ চিংকার, দূর থেকে ভেসে আসছে খেঁকশিয়ালের অটুহাস। তিন বন্ধু ছাতা মাথায় এবং হাতে হ্যারিকেন নিয়ে কাদা ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে গেলেন আলো লক্ষ্য করে। যত কাছাকাছি হলেন ততই অমৃত সব আলোর খেলা চোখে পড়তে লাগল। ততক্ষণে তাঁর থেকে তীরতর হয়ে উঠেছে সেই নীলাভ দ্যুতিগুলো। জ্বলছে, নিভছে, ছুটোছুটি করছে, যেন নেচে নেচে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভিটেময়।

তিন বন্ধুর হঠাৎ যেন সংকল্প উপস্থিত হল। একজন তো সেইখান থেকে উদ্ভবসে দৌড়ে পালালো ঘরের দিকে। অপরজন পালাবে কিনা ভাবছে—এমন সময় তরুণটি তার হাতখানা চেপে ধরে সজোরে দিলেন এক ঝাঁকুনি। বললেন—ভয় কী! এসো আমার সঙ্গে!

বন্ধুটির সর্বাঙ্গ তখন থর থর করে কাঁপছে। বলল—না, ভুতের পাল্লায় পড়ার মত আমারও সাহস নেই। আমি চললাম।

ভয় তরুণটির মনেও। তবু এত দূরে এসে কাপুরনের মত পালিয়ে যেতে কেমন যেন লজ্জা হল তাঁর। বললেন—তুমি যদি নিতান্তই আলোর কাছে যেতে না চাও তাহলে ছাতা মাথায় এইখানে বসে রাম নাম কর। আর আমি একটু একটু করে এগুই। তবে আমি তোমার নাম ধরে ডাক দিতে দিতে যাবো। আর তুমি প্রতি বারে আমার ডাকে সাড়া দেবে।

এবার সম্মত হল বন্ধুটি। সে রাম নামের অক্ষয় কবচ ধারণ করে বসে রইল এবং তরুণটি যতদূর সম্ভব মনকে শক্ত করে এগিয়ে গেলেন।

একটা মোড় ঘুরতেই তরুণটি বিস্ময়ে একেবারে হতবাক হয়ে গেলেন। আলো অনেকগুলি নয়। একটিই। সেটি আবার নিভছে না, নড়ছে না, নাচছেও না। একটা জায়গায় একেবারে স্থির হয়ে আছে।

তরুণটি এবার একটু দাঁড়ালেন। ভাবতে চেষ্টা করলেন, কেন দূর থেকে আলোটা এমন অমৃত ঠেকছিল?

সে কী দৃষ্টির বিষম নাকি মানুষের গম্ব পেয়ে ভতগলো এক জায়গায় স্থম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে এবং আকোশে ফুলছে!

অকস্মাৎ একটা দমকা হাওয়া শন শন করে বয়ে গেল বোপগলোর মাথার ওপর দিয়ে। বোপের ডালপালা-গলো নড়তেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। আলোকে ঘিরে রেখেছে কতকগুলো ডালপালা। বাতাসে আশ্মালিত হলেই ডালপালার ফাঁক দিয়ে অনেক আলো দেখা যায় এবং নাচতে বা জ্বলতে-নিভতেও দেখা যায়।

এবার তরুণটির মনে একটু একটু করে সাহস ফিরে এল। দ্রুত পা চালিয়ে দিলেন আলোটার কাছে। দেখলেন এক তাজ্জব ব্যাপার! আলোটা বার হচ্ছে বহু-দিন আগে কেটে নেওয়া হাত খানেক উঁচু একটা তেঁতুল গাছের গাঁড়ি থেকে। বৃষ্টির জলে ভিজ়ে ভিজ়ে উপরের কাঠটা একরকম পচে উঠেছে আর সেই পচা কাঠের ওপর গজিয়েছে এক ধরনের ছত্রাক। তরুণ আলতোভাবে হাতটাও ঠেকালেন। কিন্তু কী আশ্চর্য! হাতেও দেখা গেল ঠিক সেই ধরনের আলোর দৃষ্টি।

তরুণটি কাঠের টুকরো খসাতে খসাতে বন্ধুর নাম ধরে উচ্চৈশ্বরে ডাক দিলেন—ওরে চলে আয়, চলে আয়! ভুতের আলো এ নয়। কাঠের উপর গজিয়েছে একগাদা ছাতা। সেই ছাতাই বিতরণ করছে আলো।

কেবল আলোর রহস্য উদ্ঘাটন করে ক্ষান্ত হলেন না তরুণ। পরীক্ষার জন্য বেশ কয়েক টুকরা কাঠ ভেঙ্গে আনলেন। পরে বুঝতে পারলেন, পচা কাঠে বিশেষ এক ধরনের ছত্রাক উপনিবেশ গড়ে তোলে এবং ভিজ়ে অবস্থায় আলোও বিতরণ করতে পারে।

অনুসন্ধিৎসু ও সাহসী এই তরুণটির নাম গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। 1894 সালের 1লা আগস্ট অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত ফরিদপুর জেলায় লোনসিং নামক এক অখ্যাত গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন অত্যন্ত গরীব। যজ্ঞন যাজনের মাধ্যমে যতটুকু উপার্জন করতেন তাতেই কটে সৃষ্টে সংসার চলতো।

গোপালচন্দ্র ছিলেন পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর, বয়স। যখন মাত্র পাঁচ বছর সেই সময় হারালেন পিতাকে। প্রকৃতপক্ষে মা শশিমুখী দেবীই অত্যন্ত দুঃখ কষ্টের ভেতর দিয়ে মানুষ করিয়েছিলেন গোপালচন্দ্র এবং তাঁর তিন ভাইকে।

গোপালচন্দ্র ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন অত্যন্ত শাস্ত-শিষ্ট এবং মনটি ছিল সরল ও অনুসন্ধিৎসু। ঘরে মায়ের কাছে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী শুনতে শুনতে একেবারে তন্ময় হয়ে যেতেন। আবার বাইরে পা দিলে মদ্য হতেন অপরূপা প্রকৃতির রূপরাশি দেখে। গাছপালা ও জীবজন্তু থেকে ছোট ছোট পোকামাকড় পর্যন্ত কেউ

তাঁর দৃষ্টি এড়াতে পারতো না। কাজ ফেলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অমৃত সে সব কাহিনী।

কথিত আছে, কিশোর বয়সে একবার পুকুরে স্নান করতে যাওয়ার সময় হঠাৎ গাছ থেকে থলথলে জেলির মত কী একটা জিনিসকে সামনে খসে পড়তে দেখলেন। স্নান করা মাথায় উঠল। কিস্তিক্রমাকার সেই জিনিসটাকে ভালভাবে পরীক্ষণ করতে বসে পড়লেন রাস্তার ওপরেই।

কেটে গেল বেশ কিছুক্ষণ। থলথলে পদার্থটা হঠাৎ দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। ভারি মজা পেলেন তিনি। পরে কী ঘটে দেখার জন্য আরও কৌতুহলী হয়ে উঠলেন। শেষে আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন, থলথলে সেই পদার্থটি প্রথমে দুই, দুই থেকে চার, এইভাবে ক্রমান্বয়ে বিভক্ত হতে হতে অনেকগুলি খণ্ডে পরিণত হল এবং নড়তে নড়তে এগিয়ে যেতে থাকল।

অমৃত সেই জিনিসটিকে লক্ষ্য করতে গিয়ে তাঁর সেদিন যজ্ঞমানের বাড়িতে পূজা করা হয় নি, ইশ্কুলে যাওয়া হয় নি এবং সারাদিন অন্নও জোটেনি। কিন্তু ব্যাপারটা তাঁর মনে একটা বিরাট দাগ কেটে দিয়েছিল। পরিণত বয়সে বুঝতে পেরেছিলেন, সেটি ছিল না-উদ্ভিদ, না-প্রাণী এমন এক জাতীয় জিনিস—যা কালেভদ্রে কারও কারও চোখে পড়েছে।

খণ্ডিনাটিভাবে দেখার লোভ সংবরণ করতে না পারার জন্য মাঝে মাঝে তাঁকে দুর্ভোগও কম ভুগতে হয়নি। একবার পথে যেতে যেতে চোখে পড়ল, পথের পাশে এক বাড়ির জানলায় এক মাকড়সা জাল বুনে চলেছে। আর পথ হাঁটা হল না তাঁর। জানলার পাশে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন মাকড়সার কারিগরী।

এদিকে অনেকক্ষণ ধরে এক অপরিচিত ভদ্রলোককে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঘরের মালিক হলেন কুপিত। তিনি যথেষ্ট তিরস্কার করে ক্ষান্ত হননি, গোপালচন্দ্রকে গলাধাক্কা পর্যন্ত দিয়েছিলেন।

ছেলেবেলা থেকে সবকিছুকে খণ্ডিয়ে খণ্ডিয়ে দেখার আগ্রহ এবং চোখ দুইই ছিল বলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানে কোন ডিগ্রী গ্রহণ না করেও গোপালচন্দ্র পরিচিত হয়েছিলেন প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানীরূপে।

গোপালচন্দ্র অবশ্য মেধাবী ছিলেন। একমাত্র দারিদ্র্যের জন্যই তাঁর লেখাপড়া বেশিদূর অগ্রসর হতে পারে নি। 1913 সালে স্বগ্রামের লোনসিং হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করার পর উচ্চ শিক্ষার জন্য মৈমনসিং আনন্দমোহন কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। দু-বছর পড়ার পর অর্থাভাবে পরীক্ষা দিতে না পারায় সেইখানে তাঁর লেখাপড়ার পরিসমাপ্তি ঘটে।

এরপর শ্রদ্ধা হয়, তাঁর কর্মজীবন। প্রথমে সেই লেনাসিং হাইস্কুলেই শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেন। কিন্তু গোপালচন্দ্র ছিলেন অন্য ধাতুতে গড়া। প্রথম থেকেই উচ্চবর্ণের হিন্দুদের গোড়ামি এবং ভণ্ডামি সহ্য করতে পারতেন না। নিতান্ত দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও প্রভাবশালী ও অর্থবান ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের বর্ণবিষয়ে বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি গঠন করেন 'কমল কুটীর' নামে একটি সংস্থা। উক্ত সংস্থাটির মাধ্যমে সমাজের অপশৃঙ্গাদের লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা করেন এবং ভবিষ্যতে তারা যাতে যৎসামান্য রুজিরোজগার করতে পারে তার জন্যও সচেষ্ট হন।

শ্রদ্ধা কি তাই? উচ্চ জাতের গোড়ামির বিরুদ্ধে সেই সময় বহু ব্যঙ্গ কবিতা, ছড়া, কাব্য গান, নাটক ইত্যাদি রচনা করেছিলেন। একটা কবিগানের দলও খুলেছিলেন তিনি। এবং অতি অল্প দিনের মধ্যে কবিয়াল হিসাবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। শোনা যায়, কোন কোন কবিগানের আসরে এখনও গুরু গোপাল ভট্টের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়। আপদ বিনাশিনীর ব্রতকথা নামক পুস্তিকা রচনা করেও প্রচার করেছিলেন। ব্যঙ্গ কবিতাগুলি প্রকাশ করতেন 'শতদল' নামে একটি হাতে লেখা পত্রিকার মাধ্যমে।

গোপালচন্দ্রের সমাজসংস্কারমূলক কাজগুলি উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা মেনে নিতে পারেন নি। তাঁরা পদে পদে নিরোধিতা করেছিলেন এবং তাদেরই চক্রান্তে বিদ্যালয়ের চাকরি হারাতে হল। তখন তিনি বাধ্য হয়ে গ্রাম ছাড়েন এবং কলকাতার কাশীপুর এলাকায় চেম্বার অব কমার্সের একটি অফিসে টেলিফোন অপারেটরের কাজ গ্রহণ করেন।

প্রকৃতপক্ষে গোপালচন্দ্রের অসামান্য প্রতিভার প্রকাশ পায় কলকাতায় আসার পরেই। কিশোর বয়সে সেই যে নীলাভ আলো বিতরণকারী উদ্ভিদের সম্বন্ধে পেয়েছিলেন সে সম্বন্ধে একটি মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করে পাঠিয়ে দেন প্রবাসী পত্রিকায়। 1326 বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলে বহু গুণীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অতঃপর আরও একটি মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় পরের বছর আষাঢ় সংখ্যায়।

সে সময় বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু বিজ্ঞান মন্দিরে' উদ্ভিদদের নিয়ে গবেষণা করছিলেন। প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি পাঠ করে তিনি লেখক সম্বন্ধে কৌতুহলী হয়ে উঠেন এবং পরিচিত হন।

এবার যেন মণিকাণ্ডন একত্রে যুক্ত হল। জগদীশচন্দ্রের উৎসাহে গোপালচন্দ্র যোগ দিলেন বসু বিজ্ঞান মন্দিরে। এতদিনে তাঁর প্রতিভা বিকাশের পথ হল উন্মুক্ত।

গোপালচন্দ্রের ছেলেবেলা থেকেই ছিল পোকামাকড়দের প্রতি তীব্র আকর্ষণ। ওদের জীবন রহস্য উন্মোচনের জন্য সেই ছেলেবেলায় কত প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন! কতবার

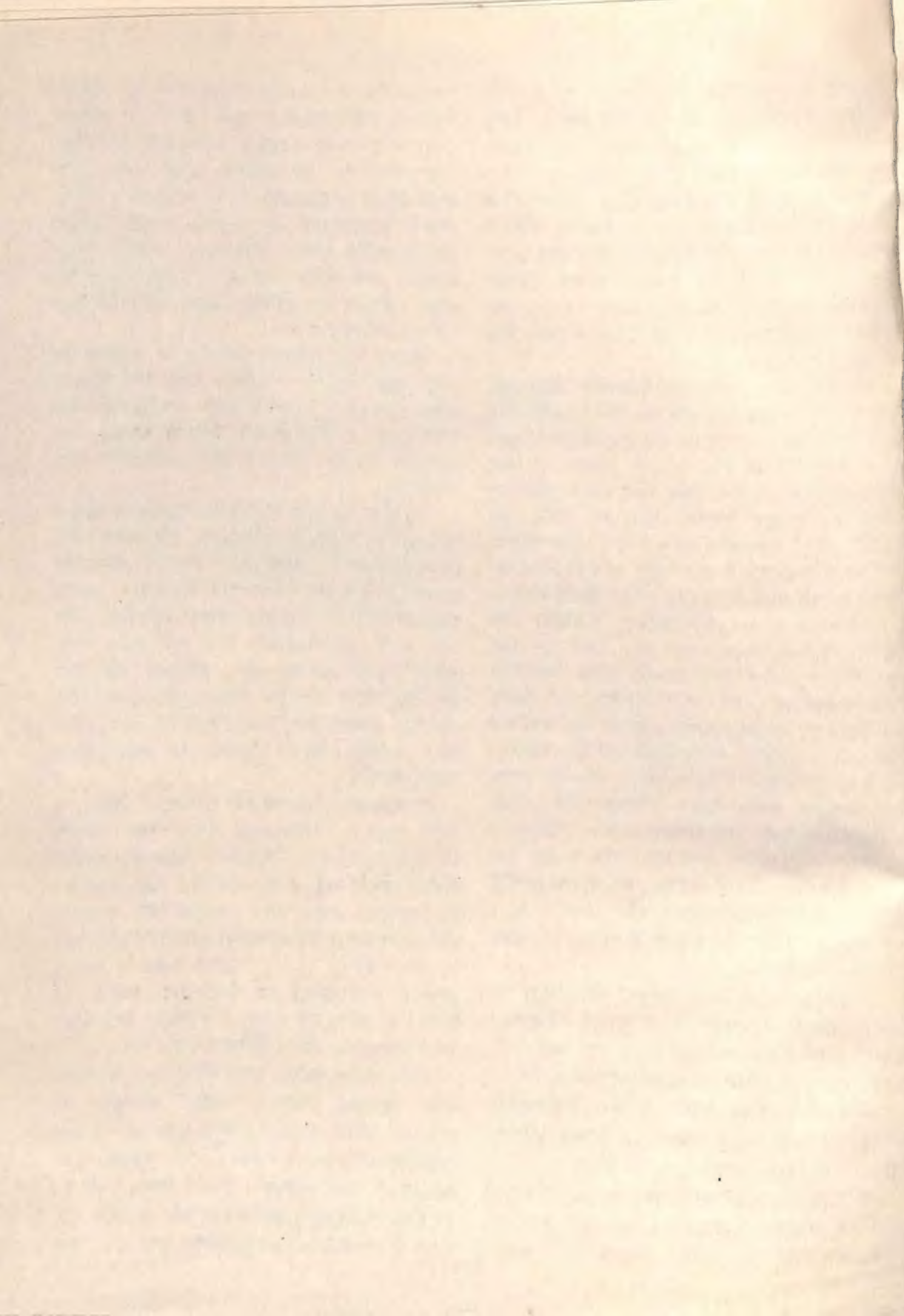
কত মোমাছি, বোলতা, বিছে প্রভৃতির দংশন সহ্য করেছেন; পিঁপড়ের কামড়ে অস্থির হয়েছেন, প্রজাপতি ও ফড়িংদের পেছ পেছ ধাওয়া করেছেন, মাকড়সাদের ঘর বানানো দেখতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রতীক্ষা করেছেন, আজ স্নেহযোগ পেয়ে তাদেরই সম্বন্ধে মেতে উঠলেন গবেষণায়। গবেষণা-গারে পিঁপড়াদের জন্য ঘর বানালেন, ব্যাঙাচিদের ওপর অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করে তাদের জীবনচক্র সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য আহরণ করলেন, জীবাণুদের প্রতিপালন করতে লাগলেন এবং বিভিন্ন ধরনের মাকড়সাকে নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালালেন।

অতঃপর তাঁর গবেষণার ফলাফলগুলি প্রকাশিত হয় দেশী বিদেশী বহু পত্র পত্রিকায়। প্রায় 800 গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন তিনি। তাদের মধ্যে প্রায় 22টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল ইংরাজী ভাষায়। এবং প্রত্যেকটি প্রবন্ধের উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করেছিলেন জীব-বিজ্ঞানীরা।

গোপালচন্দ্রের লেখা বাংলা প্রবন্ধগুলি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে অনেকখানি। তাঁর লেখার হাতটি ছিল ভারি চমৎকার। 'গান্ধী-পূর্ণ' বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি লেখার গুণে সাধারণের কাছেও অতি উপভোগ্য। একমাত্র রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ছাড়া এত চমৎকার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ আজ পর্যন্ত আর কারও দ্বারা লেখা সম্ভব হয়নি বললে মনে হয় অত্যাতি করা হবে না। অপরাধকে তাঁর লেখা এত প্রসাদ গুণে ভরা যে, পড়তে গেলে বাংলা শিশু সাহিত্যের যুগ্মধর শিল্পী অবনীন্দ্রনাথকে মনে করিয়ে দেয়। অবনীন্দ্রনাথের মত তাঁর লেখা যেন টুকরো টুকরো কতকগুলো ছবি।

গোপালচন্দ্রের গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলি বিজ্ঞানকেও সমৃদ্ধ করেছে। কীটপতঙ্গদের আচার আচরণ সম্বন্ধে বহু নতুন নতুন তথ্য যুক্ত করেছেন। আলোক উৎপাদন-কারী উদ্ভিদের সম্বন্ধে গবেষণাগুলিও অতি উচ্চাঙ্গের। তাঁদের মধ্যে প্রখ্যাত ছাত্র বিজ্ঞানী সহায়রাম বসু অন্যতম। বসু বিজ্ঞান মন্দিরে যে সব বিদেশী বিজ্ঞানী আগমন হতো তাঁরা গোপালচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করে অত্যন্ত প্রীত হতেন। এ দেশের গাছ গাছড়া ও কীটপতঙ্গ সম্বন্ধে বহু তথ্যও লাভ করতেন গোপালচন্দ্রের কাছ থেকে।

গোপালচন্দ্রের অন্যতম প্রধান কীর্তি 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামক পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠা। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ। সেই পরিষদের মুখ-পত্র হিসাবে প্রকাশ করেছিলেন 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকা। এক রকম জন্ম লগ্নেই আচার্যদেব পত্রিকা প্রকাশের গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন গোপালচন্দ্রের ওপর। গোপাল-



চন্দ্র পরম নিষ্ঠা ভরে সে দায়িত্ব প্রতিপালন করেছিলেন স্মরণীয় 30 বছর কাল ধরে। এর ফলও হয়েছে স্মরণীয় প্রসারী। বর্তমানের বিজ্ঞান লেখক মাতেই কোন না কোন দিক থেকে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ, গোপালচন্দ্র এবং তাঁদের জ্ঞান ও বিজ্ঞান পাঠকার কাছে ঋণী। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপায়ে আজকের বিজ্ঞান লেখক গোষ্ঠীকে তৈরি করেছেন তাঁরাই। মার জন্য মাতৃভাষায় বিজ্ঞান রচনার একটা যেন প্রাবল্য এসেছে।

গোপালচন্দ্র ছিলেন এক নীরব বিজ্ঞানসাধক। বিজ্ঞানের কোন ডিগ্রী ছিল না তাঁর। একমাত্র অনুসন্ধানের মন নিয়ে আমাদের চারপাশের বস্তুরাশিকে দেখতে গিয়েই তিনি বিজ্ঞানীরূপে পরিচিত হয়েছিলেন। এদিক থেকে টমাস আলভা এডিসন, হেনরি ফোর্ড, ফ্যারাডে প্রমুখ বিজ্ঞানীদের মত তিনিও এক ব্যক্তিত্ব। অপরদিকে ফ্রান্সের প্রখ্যাত স্বভাব বিজ্ঞানী জাঁ আঁরি কাসিমির ফ্যাবারের সমতুল। ফ্যাবারেরও বিজ্ঞানে কোন ডিগ্রী ছিল না এবং একমাত্র অনুসন্ধানই তাঁকে বিজ্ঞানীর মর্যাদা দিয়েছিল। তাই আমাদের দেশের তরুণদের কাছে গোপালচন্দ্র এক মণ্ডিতমান উৎসাহ।

গোপালচন্দ্র ছিলেন একেবারে প্রচার বিমুখ। সারা জীবন ধরে যা কিছু লিখে গেছেন তার অধিকাংশই হারিয়ে গেছে। এমন কি কোন পাণ্ডুলিপি রাখারও প্রয়োজন অনুভব করেননি তিনি। তাঁর এই নীরব সাধনার যোগ্য মূল্যও দেয়নি তাঁর দেশবাসী। এমন কি সারা জীবন অবহেলিত থেকে গেছেন। যা কিছু স্বীকৃতি এসেছে তা একেবারে জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়ানোর পর। মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস আগে ৮৬ বছর বয়সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে প্রদান করেছে সম্মানসূচক ডি. এস. সি.

ডিগ্রী। সাহিত্যে স্বীকৃতিস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে রবীন্দ্র পুরস্কার প্রদান করেছেন 1975 সালে 81 বছর বয়সে। আর 80 বছর বয়সের সময় তিনি লাভ করেছিলেন 'সত্যেন্দ্রনাথ বসু স্মৃতি ফলক'। শ্রদ্ধা যথাসময়ে 'আনন্দ পুরস্কার' প্রদান করে অত্যন্ত দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকা। গোপালচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের কথা প্রসঙ্গে একদিন আক্ষেপ করে বলেছিলেন 'আমাদের দেশে কত হাঁরে-মাণিক এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, কিন্তু কেউ তার খোঁজ করে না। আর খোঁজ করে না বলেই আমাদের দেশটা এত খাটো।' উক্তিটি গোপালচন্দ্রের নিজের জীবনেও পুরোপুরি সত্য।

গোপালচন্দ্র কেবলমাত্র বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান লেখক ছিলেন না। দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ সেবকও ছিলেন। স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে যে গুপ্ত সমিতি একদিন গড়ে উঠেছিল তার এক সক্রিয় সদস্য ছিলেন গোপালচন্দ্র। বসু বিজ্ঞান মন্ডরে বসে গোপনে চালিয়ে যেতেন সমিতির কাজ। কথিত আছে, নতুন নতুন ফরমুলার সাহায্যে কিছু কিছু বিস্ফোরক তৈরি করে তিনি তুলে দিয়েছিলেন বিপ্লবীদের হাতে।

গোপালচন্দ্রের সত্যিই কোন তুলনা নেই। তাঁর জীবনটাই একটা রোমাঞ্চ ভরা নাটকের মত। আজীবন দুঃখ দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোরভাবে লড়াই করেছেন কিন্তু মৃত্যুর হাসিটি ছিল অগ্নান। দারিদ্র্য থেকে মৃত্তির জন্য কোন চেষ্টাও তিনি করেননি। তাঁকে রাগ করতেও কেউ দেখেনি কোন দিন। এমন কি অতি বৃদ্ধ বয়সেও না। 1981 সালের 8ই এপ্রিল এই মহান সাধক 86 বছর বয়সে নশ্বর দেহ ত্যাগ করেছেন।

‘প্রত্যয় প্রকাশ’ এর নতুন বই

সুনীম'ল রায়

চাঁদে পাড়ি ১০.

সাধন দাশগুপ্ত

ভাষা গণিত ২০.

দেবব্রত চক্রবর্তী-র

শেরিং হত্যা রহস্য ১০.

সাধন দাশগুপ্ত

আলো আরও আলো ১৫.

সাধন দাশগুপ্ত

রোমাঞ্চকর রসায়ন ১২.

দেবব্রত চক্রবর্তী

চক্রতীর্থের চমক ১০.

: পরিবেশক :

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ

৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-৯

ছেলেবেলায় গান্ধী

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়—সঙ্কলিত

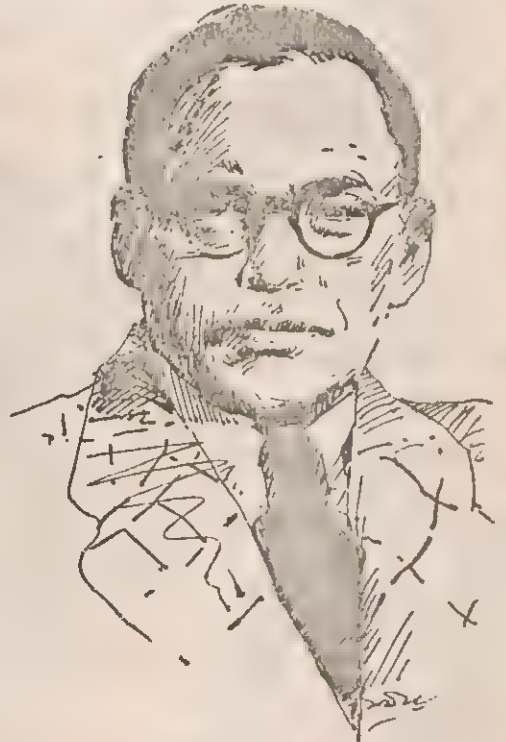
ইংরেজি ১৮৯৩ সালের ৬ অক্টোবর বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা জেলার অন্তর্গত সেওড়াতলী নামে এক গওগ্রামে মেঘনাদ সাহার জন্ম। তাঁর বাবা জগন্নাথ সাহার আর্থিক অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। গ্রামে তাঁর একটা ছোট মুদির দোকান ছিল। অল্পস্বল্প চাল, ডাল, তেল, মুন, লঙ্কা বাজার থেকে কিনে এনে বিক্রি করতেন। তাতে যারোজগার হত তাই দিয়ে কষ্ট করে কোনোরকমে সংসার চালাতেন। বাবা কোথাও চলে গেলে বালক মেঘনাদকেই দোকানের দেখাশোনা করতে হত।

মেঘনাদের বয়স যখন পাঁচ বছর, তখন তাঁর বাবা তাঁকে দোকানে নিয়ে গিয়ে কাজের ফাঁকে ফাঁকে বর্ণমালা শেখাতেন। তিনি ভেবেছিলেন, কিছুটা লেখাপড়া শিখিয়ে মেঘনাদকে দোকানের দেখাশোনা করতে বলবেন। কিন্তু মেঘনাদের ধীশক্তি দেখে তিনি বিস্মিত না হয়ে পারলেন না। একবার তাকে যা শিখিয়ে দিতেন দ্বিতীয়বার তা আর বলতে হত না। ছেলের লেখাপড়ায় আগ্রহ দেখে বাবা তাকে গ্রামের প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি করে দিলেন।

মেঘনাদ কুতিখের সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করলেন। এরপর দেখা দিল এক সংকট। কাছাকাছি কোথাও হাইস্কুল ছিল না, সাত মাইল দূরে শিমুলিয়া গ্রামে আছে মধ্য-ইংরেজি স্কুল। সেখানে কারো বাড়িতে ছেলেকে খরচ দিয়ে রেখে পড়াবার সামর্থ্য ছিল না বাবার। তবু ছেলের পড়াশোনায় গভীর আগ্রহ দেখে বাবা তাকে সাত মাইল দূরের

স্কুলেই ভর্তি করে দিলেন। মেঘনাদ প্রতিদিন সকালে পায়ে হেঁটে সাত মাইল দূরের স্কুলে পড়তে যেতেন, আবার ছুটির পর বাড়িতে ফিরে আসতেন। তার বাতায়ানের কষ্ট দেখে শিমুলিয়ার সহদয় ডা. অনন্ত কুমার দাস তাঁর বাড়িতে মেঘনাদকে বিনামূলি খরচে থাকা ও খাওয়ার সুযোগ করে দিলেন। তাঁর আশ্রয়ে পড়াশোনা করে মেঘনাদ ১৯০০ সালে মধ্য ইংরেজি পরীক্ষায় ঢাকা জেলার মধ্যে প্রথম হয়ে বৃত্তি পেলেন। এবার অনেকের দৃষ্টি পড়ল তাঁর উপর। মেঘনাদ ঢাকায় এসে কলেজিয়েটস্কুলে ভর্তি হলেন।

১৯০৯ সাল মেঘনাদ পূর্ব বাংলার ছাত্রদের মধ্যে প্রথম হয়ে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করলেন। এই সময় তিনি ব্যাপটিস্ট মিশনের বাইবেল ক্লাসেও যোগ দেন। তিনি তখন স্কুলের ছাত্র, মিশনের পরীক্ষায় বি এ ক্লাসের ছাত্রদেরও হারিয়ে দিয়ে তিনি বাংলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করলেন। এতে তিনি নগদ ১০০ টাকা পুরস্কার পেলেন। এই টাকা পেয়ে তাঁর অনেক সুরিখে হয়েছিল।



বিন্দুনি মেঘনাদ সাহা



আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

দিবাকর সেন

১৯২৯ সাল। বিদেশ সফর শেষে বোম্বাই শহরে ডি. এন. স্প্রিংজারের পেডলার রোডের বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু। তখন তাঁর মাস সন্তর পেরিয়ে গেছে। একদিন বাড়ির দোতলার ঘরে তিনি বসে একখানি বই পড়ছেন। এমন সময় গৃহস্বামীর কিশোর পুত্র গণেশলাল জগদীশচন্দ্রকে খবর দিতে এলো, বোম্বাই শহরের প্রতিষ্ঠালব্ধ বাবসায়ী শেঠ মুলরাজ খাটাউ এসেছেন। জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে চান। গণেশলাল ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাকিয়ে দেখল জগদীশচন্দ্র একাগ্রচিত্তে পড়ে চলেছেন। কোন দিকে হুস মই। বেশ কয়েক মিনিট অপেক্ষার পর গণেশলাল স্কেচের সঙ্গে দর্শন প্রার্থীর আগমন বার্তা জগদীশচন্দ্রকে জানাল। জগদীশচন্দ্র বইটি পাশে রেখে ধীরে দরজার দিকে গিয়ে গেলেন। বইটির নাম দেখে গণেশলাল আশ্চর্য হয়ে গেল। এতো বড় বিজ্ঞানী একাগ্রচিত্তে বসে শিশুপাঠ্য বই "Alice in wonderland" পড়ছিলেন। কিন্তু না, এতে সন্নিহিত হবার কিছু নেই। জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানী হলেও তিনি ছিলেন সাহিত্যিক। কবিতা না লিখলেও তিনি ছিলেন বি। তাঁর কবি বন্ধু রবীন্দ্রনাথ যেমন লিখেছিলেন,

“কেশ আমার পাক ধরেছে বটে
তাহার প্রতি নজর এতো কেন ?
পাড়ার যতো ছেলে এবং বুড়ো
সবার আমি এক বয়সী জেনো।”

একই কথা বোধহয় জগদীশচন্দ্রও লিখতে পারতেন, মনো পরিণত বয়সেও সজীবতার ও সারল্যে তিনি ছিলেন সেই সঙ্গে শিশু, কিশোর এবং যুবক।

তাঁর জীবনের সব কথা এ ছোট নিবন্ধের পরিসরে বলা সম্ভব নয়। বর্তমান নিবন্ধে আমরা শুধু তার ছোটবেলার কথা বলবো। পরিণত বয়সেও যিনি শিশুদের জন্য লিখতেন, শিশুপাঠ্য বই পড়তেন, শৈশব সম্পর্কে নিশ্চয়ই তাঁর "স্টোরিজ" ছিল। এমন মানুষের ছোটবেলার কথা শুনে নিশ্চয়ই তোমরা আশ্চর্য। সে কথাই এবার আমাদের বলবো।

১৮৫৮ সালের ৩০শে নভেম্বর তারিখে জগদীশচন্দ্রের জন্ম। বর্তমান বাংলাদেশের ময়মনসিংহ শহরে। পিতা



ভগবানচন্দ্র বসু ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি বিশ্বাস করতেন জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়সাধন ও দেশের জনগণের সঙ্গে নিজের মনের সংযোগ যদি একান্ত কাম্য হয় তবে মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষার উদ্বোধন হওয়া উচিত। জগদীশচন্দ্রকে তিনি গ্রামের পাঠশালায় পাঠিয়েছিলেন। স্কুলে সহপাঠীদের প্রায় সবাই ছিল সমাজের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর শিশু। তাদের সঙ্গে মেলামেশা করে শিশু জগদীশচন্দ্রের কীটপতঙ্গ ও গাছপালার স্বভাব লক্ষ্য করার মত একটা মন গড়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে তিনি উত্তর জীবনে বলেছিলেন, “স্কুলে দক্ষিণ দিকে আমার পিতার মুসলমান চাপরাশীর পুত্র এবং বামদিকে এক ধীরপুত্র আমার সহচর ছিল। তাদের নিকট আমি পক্ষী ও জলজন্তুর বৃত্তান্ত শুদ্ধ হইয়া শুনিতাম। সম্ভবত, প্রকৃতির কার্য অনুসন্ধানে অনুরাগ এই সব ঘটনা হইতেই আমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল।”

জগদীশচন্দ্রের শিশুমনে আরও একটি প্রবণতা দেখা যায় তাঁর বাল্যকালের অন্য দু'একটি ঘটনার ভেতর দিয়ে। প্রায়ই বালক জগদীশচন্দ্র কয়েকটি গুবরে পোকা ধরে সুতো দিয়ে যেনে দেশলাই বাজের সঙ্গে ছুঁড়ে দিতেন। তাতে সুন্দর একটি গাড়ি তৈরি হত। এইখানে ভবিষ্যৎ প্রকৃতিবাদীর



সঙ্গে ভবিষ্যৎ প্রযুক্তিবিদের মিলন ঘটেছিল। পরবর্তী সময়ে আমরা তাঁকে সরল পাশ্পিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ছোট ছোট নালির সাহায্যে একটি পোলের তলা দিয়ে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করতে দেখি। বাল্যকালে তিনি বোনেদের সঙ্গে জন্তু পুষতে ও তাদের জন্য খাচা তৈরি করতেন। পরবর্তী-কালে যখন তাঁর পিতা বর্ধমানের ম্যালেরিয়া মহামারীতে অনাথ ছেলেদের জন্য একটি শিম্প শিক্ষাকেন্দ্র খুলেছিলেন তখন কিশোর জগদীশচন্দ্র তাঁর মায়ের কাছে চেয়েছিলেন পুরোনো পেতলের বাসনপত্র দিয়ে ঐ কারখানায় একটি ছোট পেতলের কামান তৈরি করেছিলেন।

জগদীশচন্দ্রের পিতা সকালে প্রায়ই কৃষিমেলা ও শিম্প প্রদর্শণীর ব্যবস্থা করতেন। সঙ্গে থাকতো যাত্রাগান ও কথকতার আসর। সেইসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই বালক জগদীশচন্দ্র রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনাবলী জানতে পারেন। এ প্রসঙ্গে তিনি পরবর্তীকালে বলেছিলেন, “বর্তমানকালে স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূত্র ভেতর দিয়ে নৈতিক শিক্ষাদানের নীরস চেষ্টা আশানুরূপ সার্থকতা লাভ করেনি বলে অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। আমাদের শৈশবে নীতি শিক্ষার প্রণালীটা ছিল অন্যরূপ।

কথকদের মুখে রামায়ণ-মহাভারতের নানা কাহিনীর সরস ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ নৈতিক শিক্ষা লাভ করতো। জীবনের প্রাথমিক অধ্যায়ে আমাদের হৃদয়ানুভূতির ওপর যে কথকতার আবেদন তা আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। তফাৎ শুধু এই যে, তখন যা নিছক ঐতিহাসিক ঘটনার ক্রমবিস্তারিত বলে মনে করছিলাম, আজ তা চিরকালের সত্য হয়ে ধরা পড়েছে।” মহাভারতের কর্ণের নিষ্ঠা ও বীরত্ব বালক জগদীশচন্দ্রকে চিরকালের জন্য মুগ্ধ করেছিল। কর্ণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি অন্যতর বলেছিলেন, “আমিই আমার পূর্বপুরুষ, গঙ্গাকে কি কেহ জিজ্ঞাসা করে কোন উৎস হইতে তাহার জন্ম? স্রোতেই তার পরিচয়।”

জগদীশচন্দ্রের বয়স যখন এগারো তখন পিতার নির্দেশে তিনি ভর্তি হলেন কলকাতার সেন্ট জোভিয়ার্স স্কুলে। নগর সভ্যতার সঙ্গে প্রথম পরিচয়। স্কুলের প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা ছিল বড় বিচিত্র।

এই অভিজ্ঞতাটি জগদীশচন্দ্রের ব্যক্তি চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকেও অনুধাবনযোগ্য। ক্লাশ শেষে বিকেলে সদ্যপরিচিত সহপাঠীদের প্রতিনিধি হিসেবে একজন সহপাঠী তাঁকে হস্তযুদ্ধে আহ্বান করে বসলো। ব্যাপারটি পূর্বপরিচীপ্ত ও শর্তসাপেক্ষ। যুদ্ধে পরাজিত হ’লে স্কুলে আর আসা চলবে না। পরবর্তীকালে এই

ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে জগদীশচন্দ্র বলেছিলেন, সেটা লড়াইটা আমার কাছে ছিল অস্তিত্বের লড়াই। আর এ কাছে ছিল শুধুই খেলা। অস্তিত্বের প্রথমে আমাকে অমূল্য দিয়ে অসম যুদ্ধে জিততেই হলো। জগদীশচন্দ্রের বৃষ্টির প্রথম পরিচয় পেতে আমাদের আবার ফিরে যেতে হবে আরও কয়েক বছর পেছনে। পিতা ভগবানচন্দ্র সাজা-প্রাপ্ত একজন ডাকাত সর্দার সদ্য জেলখানা থেকে এসে গেছেন। স্বাভাবিক জীবনযাপনের প্রতিশ্রুতিতে বা জগদীশচন্দ্রের দেখাশুনা করার ভার তাঁর ওপর বর্তে সর্দারের সময় কাটে বালক জগদীশচন্দ্রকে নানা ডাকারি গম্প বলে। এমন সময়ে জগদীশচন্দ্রকে একটি ছোট্ট ঠাণ্ডা ঘোড়া কিনে দেওয়া হ’লো। ঘোড়ার পিঠে বসে বেড়ান জগদীশচন্দ্র। লাগাম ধরে থাকে ডাকাত সর্দার কিছুদিনের মধ্যেই শহর ফরিদপুরে এক ঘোড়দৌড়ের আবেশলো। ঘোড়ার পিঠে জগদীশচন্দ্র গেছেন দৌড় দেখতে ছোট্ট ঘোড়া ও তার ছোট্ট সওয়ারী দেখে একজন প্রতিযোগী হঠাৎ বলে বসলেন, কি হে, তুমিও কি দৌড়বে? যেম কথ্য, তেমনি কাজ। রাজা হয়ে গেলেন জগদীশচন্দ্র। হ’লো দৌড়। জগদীশচন্দ্র জয় পেলেন না। সবার শে-ক্লান্ত দেহে পৌঁছিলেন জগদীশচন্দ্র। কিন্তু নির্দিষ্ট দূরত্ব টিকি টিকি ভাবে অতিক্রম করলেন। পথে থেমে যাননি। এ শেষপর্বন্ত দেখার প্রবণতা, তা পরবর্তীকালের বিভিন্ন ঘটনা-পরিপ্রেক্ষিতে জগদীশচন্দ্রের চরিত্রে অন্ধান দেখা যায়।

ইংরেজীতে একটা কথা আছে “মর্নিং শউজ দি ডে” শৈশবের গড়ে ওঠার দিনগুলোও তেমনি অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের পরিণতির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। জগদীশচন্দ্রের শৈশবের বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীর মধ্যেও মহৎ ভবিষ্যতে ইঙ্গিত ছিল।

প্রকৃতির প্রতি শিশুমনের সেই অকৃত্রিম ভালবাসাই পরিণত বয়সে জগদীশচন্দ্রকে প্রেরণা জুগিয়েছে জড়-চেতন নির্বিশেষে সমস্ত প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মবোধের সাধনায়। প্রাণীর সঙ্গে যে জড় ও উদ্ভিদের আত্মীয়তা আছে শিশুকালেই যেন এ বোধের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল জগদীশচন্দ্রের মনে। শিশু জগদীশের সেই ঘোড়দৌড়ের ছেলমানুষীর মধ্যেই বোধকরি এ ইঙ্গিত ছিল যে, পরিণত বয়সে তিনি একক সংগ্রাম চালিয়ে প্রতিকূলতাকে জয় করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে রণপায়ে এগিয়ে যাবেন।

তাঁর কর্মক্ষেত্রে, তাঁর বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে যারা রোধের প্রাচীর তুলতে চেয়েছে বীর্যবান জগদীশচন্দ্র তাদের হেলায় তুচ্ছ করে অভিজ্ঞ ঘোড়সওয়ারের মতোই সেসব বাধা ডিঙিয়ে গেছেন।

বিজ্ঞানীদের ছেলেবেলা

সুধাংশু গান্ধী

এক : টমাস আলভা এডিসন

এক যে ছিল দামাল ছেলে। নাম তার টম। ওকে সামলাতে মা সারাটা দিন হিমসিম খেয়ে যান এবং বাবাও বিরক্ত হন।

টম আবার যা দেখে, তাকে নিজ হাতে করতে না পারলে তৃপ্তি পায় না। তার জন্য সংসারের কত জিনিসপত্র যে ভাঙচুর করে, প্রতিবেশীদের কত যে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়, কত ঝগড়া বিবাদের যে মীমাংসা করতে হয়—তার ঠিকঠিকানা নেই।

একদিন টম দেললে, একটা মুরগী পেটের তলায় ডিম চেপে বসে আছে আর কাউকে কাছে আসতে দেখলে পালকগুলো ফুলিয়ে “কৌর” “কৌর” করে উঠছে।

টম ভারি মজা পেলে। মাকে জিজ্ঞাসা করলে—মুরগীটা অমন করছে কেন মা?

মা প্রমাদ গণলেন। বললেন—খবরদার, ওকে ছুঁবিনে যেন! ও ডিম ফোটাচ্ছে। ছুঁয়ে ফেললে একটিও ডিম ফুটবে না।

টম একেবারে বাধ্য ছেলের মত কিছুটা বললে না। শুধু দিনে দুবার মুরগীটার কাছে যেতো এবং ডিম ফুটে বাচ্চা বেরুলো কিনা দেখতো।

সত্যি সত্যি ডিম ফুটলো একদিন। গোল গোল চমৎকার বাচ্চাগুলোকে কিচরিমিচরি করতে দেখে খুঁট-ব খুঁশি হলো টম। সেই সঙ্গে একটা বুদ্ধিও এসে গেল তার মাথায়।

সকাল থেকে টমের পাতা না পেয়ে মা’তো খুঁজে খুঁজে সারা! শেষে অনেক কষ্টে তাকে আবিষ্কার করলেন অন্ধকার ঘরের এক কোণে। একটা ভাঙা ব্যাটার উপর খড়-কুটো পার্টিয়ে বসে আছে চূপচাপ। মা অবাক হয়ে গালে হাত দিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—তুই ওভাবে চূপচাপ বসে কেনরে টম!

টম খাটো গলায় বললে—আমাকে ছুঁয়ো না মা, ডিম ফুটবে না! —ডিম ফুটবে না! যেন আকাশ থেকে পড়লেন মা। বুঝতে পারলেন, টম ঘাই হোক একটা কাণ্ড বাধিয়েছে। জোর করে টমকে টেনে তুলতে দেখলেন,

ব্যাটার উপর পড়ে আছে একগাদা ভাঙা ডিম। আর ডিমের কুসুমে ও লালায় ব্যাটার খড়-টমের জামাপ্যান্ট সবই চটচট করছে।

মা তো একেবারে ধ’। রান্নাঘরে গিয়ে দেখলেন, যা ভেবেছেন তাই। একটিও ডিম নেই সেখানে।

এই দুর্ঘটনা ছোট্ট আর কেউ নন, বিজ্ঞানের মাদকর টমাস আলভা এডিসন। লেখাপড়া আদৌ করেননি বলা চলে। ‘শুধু জিজ্ঞাসা এবং হাতে নাতে করে দেখার প্রবণতাই তাঁকে শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারকের সম্মান এনে দিয়েছিল। বিজ্ঞান রাজ্যের এক বিস্ময় তিনি।

দুই : জুব্বারাও

পিঠেপিঠি দুই ভাই। বেজায় ভাব। একজন ছাড়া অপরের চলে না কিছুতেই। একদিন বড় ভাইকে ধরলো রোগে। রোগটা বাড়াবাড়ি হতে বাবা ডেকে আনলেন শহরের নামকরা এক চিকিৎসককে।

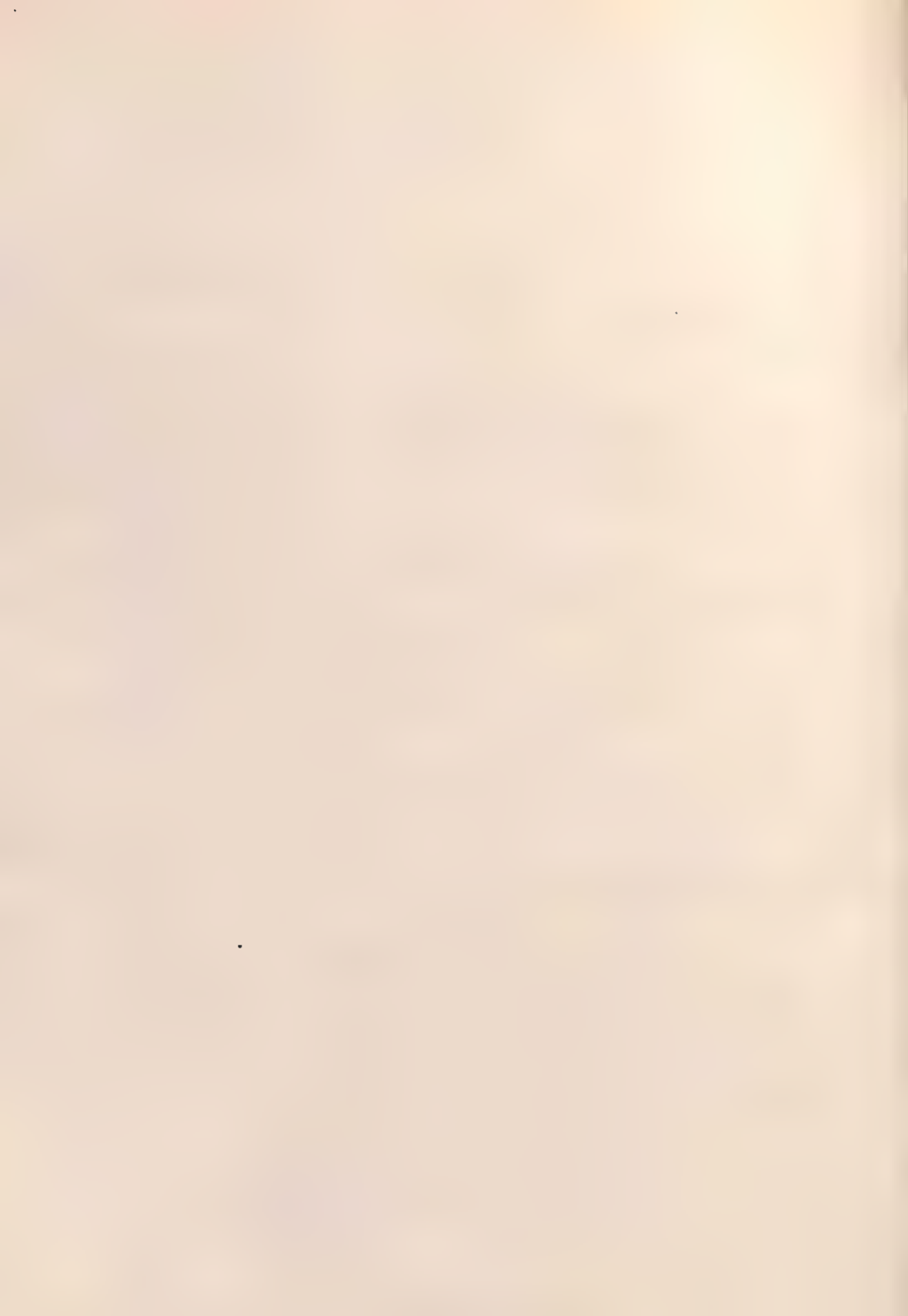
রোগীকে দেখে হতাশ হলেন চিকিৎসক। বললেন—রোগীর শ্রুত হয়েছে। শ্রুতরোগের কোন প্রতিষেধক না থাকায় রোগীকে বাঁচানো যাবে না।

সত্যসত্যি রোগী একদিন মারা গেল। ছোটভাইটি খুব করে কাঁদলে। অবশেষে প্রতিজ্ঞা করলে “আমি বড় হলে ডাক্তার হবো এবং পৃথিবীর কোন ভাইকে আর শ্রুতরোগে মরতে দেবো না।”

ছেলেবেলার প্রতিজ্ঞা অনেকের মনে থাকে না, কারও কারও বা অশ্রদ্ধা বৈরাগ্য আসে এবং গভীর শোককেও সময় ভুলিয়ে দেয়। কিন্তু ভুলতে পারলে না বালকটি। দরিদ্র এক কেরানীর সন্তান হয়েও একমাত্র মনের জোরকে অবলম্বন করে ডাক্তারী পাশ করলে এবং শ্রুতরোগ সম্বন্ধে গবেষণায় মেতে উঠলে।

অচিরেই সে বুঝতে পারলে, দেশেও রোগ সম্বন্ধে গবেষণা করার কোন সুযোগ নেই। তাকে যেতে হবে সাগরপারে।

কপর্দকশূন্য হয়েও তরুণটি হার মানলে না। নেপোলিয়নের উৎসাহ নিয়ে সামান্য এক বৃত্তিকে অবলম্বন করে মহাসাগর ডিঙিয়ে উপস্থিত হল লণ্ডনে। সেখানেও



উপযুক্ত গবেষণাগার না থাকায় সামান্য পাথের সংগ্রহ করে পাড়ি দিল আমেরিকায়।

এক্কেবারে অজানা দেশ। না আছে চাকরী, না আছে ট্যাকে পরসা। শেষটায় কুর্লিগির করে পেট চালাতে হলো। উঃ সে কী কষ্ট! হয়ত ছেলেবেলা থেকে অহরহ দারিদ্রের কশাঘাত সহ্য করে এসেছিল বলে জীবনের এই চরম পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হয়ে গেল। মাথা নত করতে বাধ্য হলো বাধার হিমালয়। একদিন গবেষণার সুযোগ পেয়ে দারিদ্রের সম্ভান হলো জগৎপুণ্য। শূদ্ধ শ্রুত নয়, পেলেগ্না রোগকেও পৃথিবী থেকে বিতাড়িত করে দ্রাভূপ্রেমের এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করলে।

সেদিনের সেই দ্রাভূহার্য ছেসেটি ভারতমাতার অন্যতম সুসম্ভান ডাঃ ইয়েলোপ্রাগদা সুখার্য। এত বেশী ওষুধ তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে, জীবদশায় পরিচিত হয়েছিলেন “আশ্চর্য ওষুধ সমূহের আবিষ্কারক অত্যশ্চর্য ভাস্কর।” সুখার্যইসিন নামক এ্যান্টিবায়োটিকটি আজও তাঁর নামকে বহন করে চলেছে।

তিন : হেনরি ফোর্ড

দশ বছরের এক বালক—নাম তার হেনরি।

হেনরির পড়াশোনায় আদৌ মন বসে না। তবে করাত চালাতে, বাটালি ধরতে এবং পরিত্যক্ত জু, কাঠের টুকরো, পেরেক ইত্যাদি দিয়ে খেলনা তৈরি করতে তারি ওস্তাদ। এক্কেবারে পাক্কা কারিগর যেন।

হেনরির বাবার একটা পকেট ঘড়ি ছিল। ঘড়িটা কেমন টিকটিক শব্দ করে, কাঁটাগুলো আপনিনই সরে সরে যায়, যেন জ্যাস্ত একটা কিছু। হেনরির ভারি ইচ্ছে, একবার হাতে নিয়ে খুলে দেখে। কিন্তু বাবার চোখকে কিছুতেই ফাঁকি দেওয়া যায় না।

একদিন সুযোগ এসে গেল। বাবা ঘরে নেই, অথচ ঘড়িটা পড়ে আছে টেবিলের উপরে। হেনরি ঘড়িটাকে নিয়ে সটান সরে পড়লে অন্য ঘরে। কিন্তু খুলতে গিয়ে এক্কেবারে নজেহাল। কিছুতেই খোলে না জু গুলো।

তাই বলে দমবার পাশ হেনরি ছিল না। বুদ্ধি করে মার সেলাইর শাস্ত থেকে মোটা সূচ একটা নিয়ে এবং তার গাথাটাকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে জু জাইভার বানিয়ে নিলে। জু খুলতে আর অসুবিধে হলো না।

কী কাজে মা এসে ঢুকলেন ঘরে। ঘড়ির অবস্থা দেখে গলা ছেড়ে কান্দতে ইচ্ছে হলো তাঁর। শূণ্য বললেন—তুই কী সর্বনাশা রে হেনরি।

হেনরি মুখ না তুলেই জবাব দিলে—তুমি কিছু ভেবোনা মা, একুণি ঠিক করে দিচ্ছি। বিশ্বাস হলো না মায়ের

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। পাংশু মুখে বলে গেলেন—তুই আমাদের ভিখিরী না করে ছাড়বিনে দেখছি।

একটু পরে মায়ের কাছে ছুটে গেল হেনরি। মায়ের হাতে ঘড়িটা গুঁজে দিয়ে বললে—ঠিক বলেছিলাম কিনা! এবার তোমাদের সবার জন্য এক একটা করে ঘড়ি বানিয়ে দেবো।

মা নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না।

এই হেনরি, আমেরিকার প্রবাদ পুরুষ হেনরি ফোর্ড। লেখাপড়া অল্প শিখেও কেবলমাত্র চোখকে খুলে রেখে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ এক প্রযুক্তিবিদ রূপে পরিচিত হয়েছিলেন। আজকের বিভিন্ন ধরনের মোটর গাড়ীর রূপকার তিনিই। প্রবাদ আছে, সমগ্র আমেরিকাকে হেনরি ফোর্ড চাকার উপর বসিয়ে দিয়ে গেছেন।

চার : চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামান

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তো চৌদ্দ-পনের বছরের এক বালক। একদিন এক বিজ্ঞান পত্রিকায় খ্যাতনামা বিজ্ঞানী লর্ড র্যালের শব্দ বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কতিপয় মতবাদ দেখে মতবাদগুলিকে যাচাই করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। বন্ধু আশ্বরাওকে ডেকে প্রথমে মাথা ঘামালে, তারপর কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে, অবশেষে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের শরণ নিলে, কিন্তু কিছুতেই সমাধানের সূত্র খুঁজে পেলেন না।

বালকটির এবার কেমন যেন রোখ চেপে গেল। এক রকম নাওয়া-খাওয়া ভুলে নিজেরই নিমগ্ন হল গভীর চিন্তায়। শেষে সমাধানের সূত্র একটা খুঁজে পেলেও নতুন কতকগুলো সমস্যার জড়িয়ে পড়ল।

মহাভাবনায় পড়লে বালক। সমস্যাগুলোর সমাধান না করায় কিছুতেই শান্তি পেল না। উপায় না দেখে শেষ পর্যন্ত সেই র্যালেকেই লিখলে চিঠি এবং জানালে তার নতুন নতুন সমস্যার কথা।

চিঠি পেয়ে বেজায় খুশি হলেন র্যালে। বালকটির মতামত এবং তার সমস্যা—দুইই প্রকাশ করলেন বিলেতের নামকরা এক বিজ্ঞান পত্রিকায়। এই বালক বড় হয়ে যে একজন নামকরা বিজ্ঞানী হবেন—এ অভিমতও ব্যক্ত করলেন।

হয়েছিলও তাই। উত্তরকালে বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেইনি ভারতবাসীর মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন। বলাবাহুল্য, ইনিই স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামান। অনুসন্ধিৎসা মানুষকে কত যে বড় করতে পারে—তার প্রমাণ ইনি একজন।

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী
শ্রীনিবাস রামানুজান
রবীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বের বিজ্ঞানের ইতিহাসে ভারতীয় গণিতজ্ঞ শ্রীনিবাস রামানুজান এক পরম বিস্ময়! বিস্ময় এই কারণে যে, মাত্র 32 বছরের জীবনকালে তিনি গণিতের ক্ষেত্রে যে অনন্য প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন, তার দ্বিতীয় নজির আজ তাঁর জন্মশত বর্ষ পরেও মেলে নি।

রামানুজানের এই বিরল প্রতিভার পরিচয় ছোটবেলা থেকেই প্রকাশ পায়। দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ রাজ্যের (বর্তমান তামিলনাড়ু) তাঞ্জোর জেলার অন্তর্গত কুন্ডকোনম শহরে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে 1887 সালের 22 ডিসেম্বর রামানুজানের জন্ম। তাঁর বাবা কুম্পুস্বামী আর্যঙ্গার কুন্ড কোনমে এক কাপড়ের দোকানে সামান্য হিসাব রক্ষকের কাজ করতেন। আর তাঁর মা কোমলতা আশ্বল ছিলেন তাঞ্জোর জেলার সংলগ্ন কোয়াম্বাটুর জেলার এরোদ শহরে মুলেক কোটের এক বেলিফের কন্যা।

রামানুজানের বয়স খখন পাঁচ বছর, তখন তার বাবা তাকে কুন্ডকোনমের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন। এখানে সে তামিল অঙ্কর ও প্রাথমিক গণিতের পরিচয় লাভ করে। অনেক সময় রাতে সে আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে থাকত এবং পরের দিন ক্লাশে এসে গণিতের শিক্ষককে তারার আকার ও পৃথিবী থেকে তাদের দূরত্ব সম্পর্কে নানা জটিল প্রশ্ন করত। এই সব প্রশ্ন শুনে। মাস্টারশাই খত না অবাক হতেন, তার চেয়ে বেশি অবাক হত তার সহপাঠীরা। তারা উপলব্ধিই করত, রামানুজান তাদের চেয়ে অনেক ভালো অংক জানে। এজন্যে অঙ্কের যেসব জটিল প্রশ্ন তারা নিজেরা সমাধান করতে পারত না তা করে দেবার জন্যে তাকে বলত! রামানুজান খুশি মনে সেসব প্রশ্ন সমাধানের চেষ্টা করত এবং করেও দিত। কখন কখন তারা দুই-তিন করে তাকে জটিল প্রশ্ন দিত। যখন সে সেই প্রশ্নের সমাধান বার করার জন্যে নিমগ্ন হয়ে যেত, তখন তারা তার ইজেরের ওপর পাথরের নুড়ি রেখে দিত। সমাধান বার করে যখন সে উঠে দাঁড়াত, তখন পাথরের নুড়িগুলো পড়ে যেত আর বন্ধুরা হেসে উঠত। এভাবে রামানুজানকে ঠিক করে তারা আনন্দ উপভোগ করত। কিন্তু রামানুজান এতে অশ্রদ্ধেয় করতে না।

এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 1894 থেকে 1897 পর্যন্ত চার বছর রামানুজান শিক্ষা লাভ করে। 1897 সালে শেষ



শ্রীনিবাস রামানুজান

প্রাথমিক পরীক্ষায় রামানুজান সমগ্র তাঞ্জোর জেলার পরীক্ষার্থীদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করে। তখন তার বয়স দশ বছর। ছোটবেলা থেকেই তার স্মৃতি শক্তি ছিল অসাধারণ। যখন তার বয়স মাত্র 6 বছর, তখন সে সংস্কৃত ব্যাকরণের আত্মনেপদী ও পরম্পদী ধাতুরূপ নির্ভুল ভাবে বলতে পারত এবং 'পাই' π (পিরিখি ও ব্যাসের অনুপাত) এর মান ও 2-এর কম্বিল বেশ কয়েকঘর দশমিক পর্যন্ত ঠিক ঠিক বলে দিত।

1898 সালে রামানুজান কুন্ডকোনম টাউন স্কুলে ভর্তি হয় এবং প্রাথমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্যে অর্ধ বেতনে পড়বার সুযোগ পায়। ক্লাশে বসে বেশির ভাগ সময়েই সে অঙ্ক কষত। অঙ্কে সে যে প্রতি বছরই ক্লাশের ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নম্বর পেত তা বলাই বাহুল্য। রামানুজানের অঙ্ক কথার এই অদ্ভুত আকর্ষণ দেখে ক্লাশের মাস্টার-শাইরা তেমন গুরুত্ব দিতেন না (এদেশে যা সচরাচর ঘটে থাকে)। কিন্তু তার বন্ধু-বান্ধবেরা এ ব্যাপারে তাকে প্রচুর প্রেরণা যোগাত। তারা নানারকম অঙ্কের বই তাঁর কাছে এনে দিত। সেসব বই পেয়ে রামানুজানের আনন্দের সীমা থাকত না। জানা-অজানা সব রকম অঙ্কের প্রশ্ন নিয়ে

সে মাথা ঘামাত। তার একটা অসুস্থ স্বভাব ছিল, অঙ্কের বই-এর কোনো অঙ্কই সে বই-এ যেভাবে কষে দেওয়া আছে তা না দেখেই নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে করবার চেষ্টা করত এবং কসেও ফেলত।

রামানুজান যখন নবম শ্রেণীর ছাত্র, তখন একদিন ক্লাশের অঙ্কের মাস্টারমশাই বললেন : যেকোনো সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে তার ফল হবে 1 (এক)। মাস্টার মশায়ের এই কথা শুনে রামানুজান সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলো : '0'-কে যদি '0' দিয়ে ভাগ করি তার ফলও কি 1 হবে ?

এমন অসুস্থ প্রশ্ন মাস্টারমশাই এর আগে কোনো ছাত্ররা কাছে কখনও শোনেন নি। তাই রামানুজানের এই অসুস্থ প্রশ্ন শুনে তিনি হকচাকিয়ে গেলেন। কি উত্তর দেবেন তা ভেবে ঠিক করতে না পেরে অন্য প্রসঙ্গে বলে গেলেন।

স্কুলের শেষ বার্ষিক পরীক্ষায় গণিত বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্বের জন্যে রামানুজকে পুরস্কার দেওয়া হয়। পুরস্কার বিতরণী সভায় প্রধান শিক্ষক মশাই রামানুজনের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন : 'এই ছাত্রটি গণিতের প্রথম পড়ে অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছে এবং আমাদের গণিত-শিক্ষকের মতে সর্বোচ্চ নম্বরের চেয়েও বেশি নম্বর পাবার সে যোগ্য।' রামানুজনের অনন্য গণিত প্রতিভার এই হলো প্রথম স্বীকৃতি।

1903 সালে কুন্তকোনম টাউন হাই স্কুল থেকে রামানুজান প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এরপর সে কুন্ত কোনমের সরকারী কলেজে এফ এ (বর্তমানের উচ্চ মাধ্যমিক) ক্লাশে ভর্তি হয়। কলেজ জীবনে ঢোকার পর থেকে গণিতের প্রতি তার অস্বাভাবিক আগ্রহ প্রকাশ পায়। কলেজের লাইব্রেরি থেকে একদিন সে G. S. Carr রচিত A Synopsis of elementary results in pure and Applied mathematics বইটি চেয়ে এনে পড়ে। এই দিনটিতে 'নির্ঘ'য়ের স্বপ্নভঙ্গ'-এর মতো একটি নতুন জগতের দ্বার তার কাছে খুলে যায়।

কলেজ-জীবনে এভাবে গণিতচর্চা নিয়ে মেতে থাকার ফলে অন্যান্য বিষয়ের প্রতি রামানুজান তেমন নজর দিত না। কলেজে প্রথম বার্ষিক পরীক্ষায় ইংরেজি ও অন্যান্য বিষয়ে কম নম্বর পাওয়ায় সে সিনিয়র এফ এ ক্লাশে উঠতে পারলো না ও তার বৃত্তিও কাটা গেল। এতে অভ্যস্ত বিমর্ষ হয়ে সে অন্য কলেজে ভর্তি হবার কথা ভাবতে লাগলো। অনেক চেষ্টাচরিত্রের পর মাদ্রাজে একটি নামকরা বেসরকারী কলেজে জুনিয়র এফ এ ক্লাশে সে ভর্তি হলো। এই কলেজে পড়বার কিছু কাল পরে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। ফলে তার কলেজে পড়ার ছেদ ঘটে। কুন্ত কোনমে মা বাবার কাছে তাকে ফিরে আসতে হয়। শরীর সুস্থ হবার পর বাবা তাকে প্রাইভেট

পরীক্ষার্থী রূপে এফ. এ পরীক্ষা দিতে বললেন। বাবার ইচ্ছামতো 1907 সালে রামানুজান প্রাইভেটে এফ.এ পরীক্ষা দিল। কিন্তু বিধি বাম! গণিতে 100র মধ্যে 100 নম্বর পাওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য বিষয়ে কম নম্বর পাওয়ায় পরীক্ষায় সে কৃতকার্য হতে পারলো না। এবং এইখানেই তার প্রথাগত শিক্ষার ইতি ঘটেগো। এরপর শুরু হলো জীবন-সংগ্রাম।

ইতিমধ্যে তার মা-বাবা ছেলের মতিগতি ফেরবার উদ্দেশ্যে ন বছরের জানকী আম্মলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন। বিয়ের পর মা-বাবার আর্থিক সাহায্যের উপর নির্ভর না করে নিজের জীবিকা অর্জনের জন্যে রামানুজান আশ্রয় চেষ্টা করতে লাগলেন। বহু জন ও বহু প্রতিষ্ঠানের দ্বারস্থ হবার পর 1912 সালে মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাস্টের হিসাব বিভাগে মাসিক 30 টাকা বেতনে করণিকের চাকুরি পেলেন। পোর্ট ট্রাস্টে কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাঁর গণিত চর্চাও চলতে লাগলো।

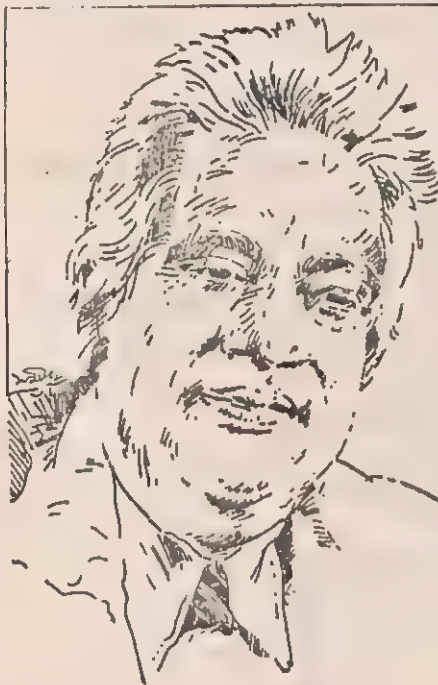
রামানুজান তাঁর গণিত চর্চার ফসল দুটি খাতায় লিখে রাখতেন। এই খাতা দুটি পরবর্তীকালে 'রামানুজনের নোট-বুক' বলে আখ্যাত হয়। পোর্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান সার ফ্রানসিস স্ট্রীংকে রামানুজান তাঁর গণিত চর্চার খাতা দুটি দিয়ে মূল্যায়ন করতে বলেন। সার স্ট্রীং নিজে গণিতের লোক ছিলেন। রামানুজনের খাতা দুটি দেখে তাঁর গণিত-চর্চার অভিনবত্ব তিনি বিস্মিত হন। কিন্তু তার যথার্থ মূল্যায়ন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কৌশলজ্ঞ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজের প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ অধ্যাপক জি এইচ হার্ডির কাছে তিনি রামানুজানকে তাঁর নোটবুক দুটি পাঠাতে বলেন। অধ্যাপক হার্ডি পূর্ণ বিকাশের জন্যে রামানুজানকে কৌশলজ্ঞ আসবার জন্যে সাদর আহ্বান জানানলেন। ধর্ম ও সংস্কারের বশে রামানুজান প্রথমে তাঁর প্রস্তাবে রাজী হন নি। পরে তাঁর মা'র অনুমতি পেয়ে তিনি কৌশলজ্ঞ যেতে রাজি হলেন।

1914 সালের এপ্রিল মাসে রামানুজান কৌশলজ্ঞে এসে উপস্থিত হলেন এবং ট্রিনিটি কলেজে গণিত বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন। 1918 সাল পর্যন্ত চার বছর তিনি কৌশলজ্ঞে ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে উচ্চতর গণিত বিষয়ে তাঁর 27টি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়, তার মধ্যে 7টি হার্ডির সহযোগে। এই গবেষণাপত্রগুলি ইউরোপের গণিতজ্ঞ মহলে উচ্চ প্রশংসিত হয়। গণিতে তাঁর বিশিষ্ট অসদানের স্বীকৃতিতে 1916 সালে ট্রিনিটি কলেজ তাঁকে স্নাতক ডিগ্রী প্রদান করেন। আর 1918 সালে লণ্ডনের রয়েল সোসাইটি অনন্য গণিতপ্রতিভার স্বীকৃতিতে রামানুজানকে 'ফেলো' নির্বাচিত করেন।

হেলো বেলার নাম

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

"১৯০৯ সালের কথা। স্বদেশীর যুগ। ভাল হেলেরা বেশীর ভাগ বিজ্ঞান পড়তে চাইছে। অঞ্চল সব কলেজে ছাত্রদের কাজের সুব্যবস্থা তখনও গড়ে ওঠেনি। নামকরা ৩৪টি কলেজেই বিজ্ঞান বিভাগে ছাত্রদের ভিড়। আবার যাদের উচ্চাভিলাষ, পরে বিজ্ঞানী হবে তারা অনেকেই প্রেসিডেন্সি কলেজে এসেছে। কারণ জগদীশ বোস ও প্রফুল্ল রায়কে প্রত্যহ স্বচক্ষে দেখতে পাবে। আচার্য রায় তখন প্রথম বছর থেকেই ইনটারের ছাত্রদের রসায়ন পড়াতেন। পুরনো বাড়ির দোতলায় উত্তর-পূর্ব কোণে গ্যালারীতে ক্লাস বসতো। সেখানে অনেক



সময় অন্য কলেজের ছাত্রেরাও এসে-জুটতে রায়ের বক্তৃতা শুনতে। সরল ইংরেজিতে বক্তৃতা বাগিতার কোন চেষ্টা ছিল না। বরং নানা বলে হাসি-ঠাট্টার মধ্য দিয়ে ডঃ চাইতেন, রসায়নের মূল কথা যাতে ছাত্রদের মনে গেঁথে যায়।

শান্তিষ্ঠ সুবোধ বালকের সুনাম কলেজে ছি না। তাছাড়া গুরুজনের মুখের উপর প্রত্যহ দেবার রোগে মারা জীবন ভুগেছি। তাই কোন বিশেষ কোন কারণে, বা আমার এখন মনে নেঃ ডঃ রায়ের মনে হয়েছিল, ক্লাসের বক্তৃতা নিজে যথো মনোযোগ দিয়ে শুনছি না এবং নিকটের বন্ধুদের চিত্তবিক্ষেপ ঘটিয়েছি। তাতে আদেশ জারী হই—বক্তৃতার সময় সকলের থেকে পৃথক হয়ে বসতে হবে মঞ্চের রেলিং-এর উপরে—সেখানে উপবঃ বোঝাই ক্লাসের টেবিল, যেখানে গুরুদেব খঃ দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেন প্রত্যহ। শান্তির ফল আঃ পক্ষে ভালই দাঁড়িয়ে গেল সব দিক থেকে। চোঃ খারাপ, তাই কাছ থেকে এখন পরীক্ষাপঃ প্রত্যেক অঙ্কটি নিখুঁতভাবে দেখতে পেতাম। পিছনের খাস কামরায় আচার্যের অনেক গুরুত্বঃ গবেষণায় তখন ব্যাপ্ত থাকতো যেসব ছাত্রঃ তাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ও জন্মে গেল। নতুন অনেক পরীক্ষার কথা শুনতাম, কার্যবিধি দেখতাম। অবশ্য ক্লাস শেষ হবার পর। সভ্য বলতে কি গুরুত্ব বিরাগভাজন হইনি কোনদিন—তার সঙ্গে কিলচড় ঘুষি সর্বদাই জুটেছে।

সে সময় কলেজ উঠানের চালাঘরে আমাদের পরীক্ষাগুলো করতে হতো। সেখানে একপাঃ পঞ্চম বর্ষের হেলেরাও কিছুদিন কাজ করেছিলেন। কলেজের অদল-বদল তখনও পুরোপুরি হয় নি। পবিত্রবাবু তখন আমাদের হাতের কাজের তদারক করতেন। চঞ্চল প্রকৃতির ছাত্রদের বেশে রাখঃ তাঁকে মাঝে মাঝে বেশ-বেগ পেতে হতো।"

স্মৃতিকথা : সত্যেন্দ্রনাথ বসু

ভিক্টর মরিজ্ গোল্ডস্মিথ

মুম্বায়ী দাস



গোল্ডস্মিথ

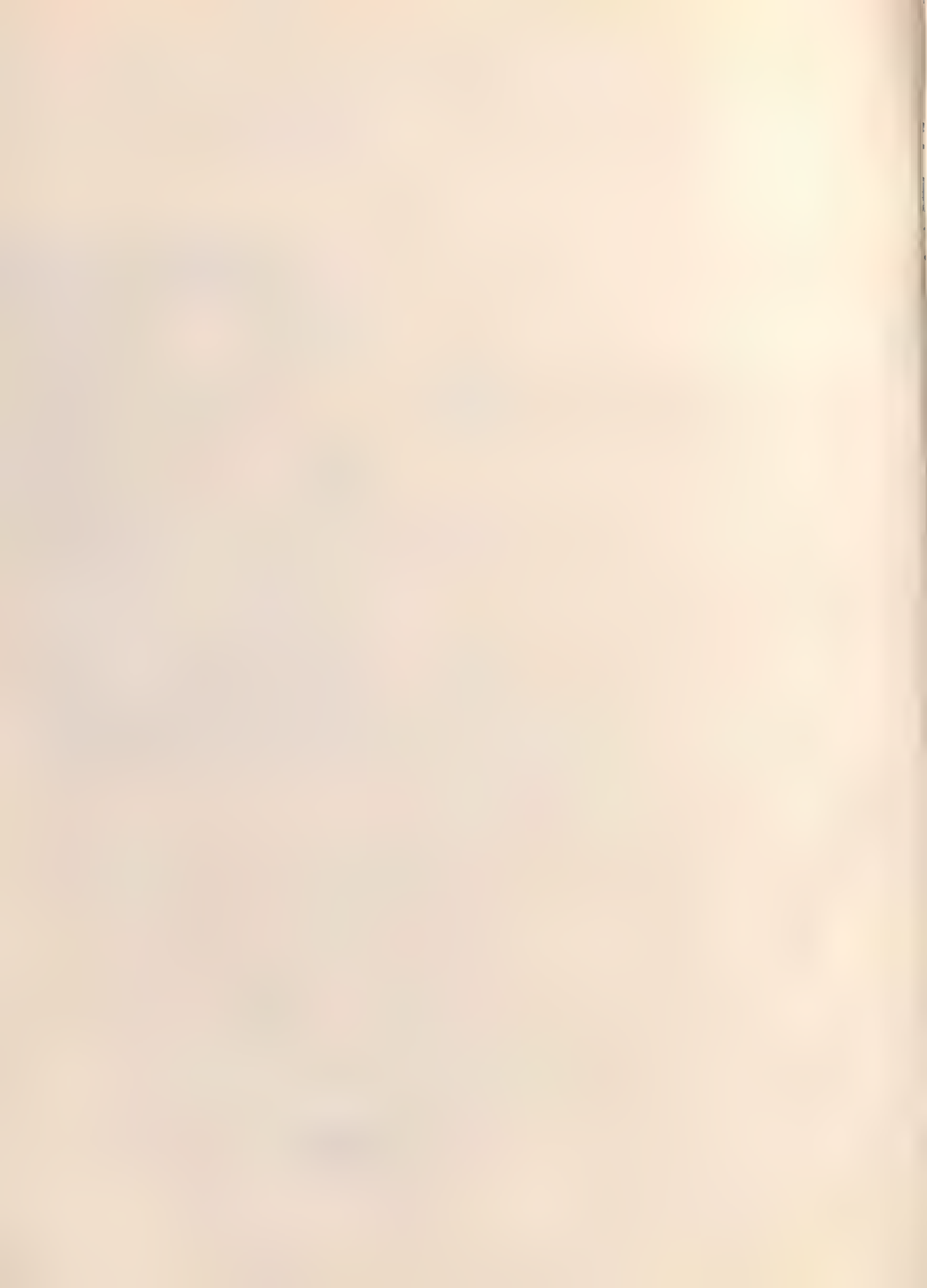
তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে। 1942-এর নভেম্বরের এক হাড় কাঁপানো শীতের রাত। স্তূপাকার খড়ে বসে কয়েকটি গাড়ী নাৎসীবাহিনী অধিকৃত নরওয়ে শান্ত পেরিয়ে সুইডেনে প্রবেশ করছে। খড়ের গাদায় কয়েকটে পালাচ্ছে কিনা পরীক্ষা করার জন্য জার্মান সৈন্যরা খড়ের মধ্যে বেয়নেটের খোঁচা মেরে মেরে পরীক্ষা করছে। পরীক্ষার পর গাড়ীগুলি একে একে সুইডেনের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করল। খানিকটা যাবার পর একটা খড়ের মধ্যে থেকে লাফিয়ে নামলেন যোগা ছোটখাটো বয়স্ক এক পোড়, বয়স বছর চুয়ান্ন। জার্মান সৈন্যরা বেয়নেটের আঘাত এড়িয়ে সেদিন নেহাৎ ভাগ্যবলেই তার দুয়ার থেকে ফিরে এসেছিলেন এই মানুষটি, আধুনিক রসায়নের জন্মদাতা, ভিক্টর মরিজ্ গোল্ডস্মিথ।

1788 সালের 27শে জানুয়ারী সুইজারল্যান্ডের জুরিখে তার জন্ম। পিতা হাইনরিখ জ্যাকব গোল্ডস্মিথ ছিলেন একজন কালীন অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরী রাজ্যের প্রাগ থেকে আগত একজন নামকরা ভৌত রাসায়নিক। পিতা হাইনরিখ, মাতা এমিলি তাদের একমাত্র সন্তান ভিক্টরকে নিয়ে ছোট্ট সংসার। তাঁরা দুজনেই ছিলেন ইহুদী। পিতা অধ্যাপকের পদ নিয়ে হাইডেলবার্গে গিয়ে ভিক্টরের প্রথম জীবনের পড়াশোনা হাইডেলবার্গেই। 1905 সালে হাইনরিখ অসলোতে, নরওয়ের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় যোগদান করেন, এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজস্ব ভূবিদ্যা, অজৈব ও ভৌত রসায়ন পড়তে থাকেন।

1911 সালে ডক্টরেট ডিগ্রী পাওয়ার পর ভিক্টর অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার এবং 1914 সালে মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের খনিজতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক ও অধিকর্তার পদে যোগ দেন। এই অসম্পন্ন হয়েই দুটি বিখ্যাত গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। এর একটি 'সোডা আশি পৃষ্ঠার, যাতে তিনি সমগ্র অনালা অণুগুলির প্রকৃতি ও পর্বতের ভূমধ্যস্থতার সম্বন্ধে তাঁর মৌলিক গবেষণার ফলাফল লিপিবদ্ধ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেই তিনি ও তাঁর পিতা নরওয়ের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। যুদ্ধের সময় নিরপেক্ষ দেশগুলি সমুদ্র পারের দেশগুলির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় শিপ্পের জন্য

প্রয়োজনীয় কাঁচামালের সরবরাহ পেত না। স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য 1917 সালে নরওয়ে সরকার দেশের নিজস্ব খনিজ সম্বন্ধে গবেষণার জন্য গোল্ডস্মিথকে সরকারের 'র-মেটিরিয়াল কমিশনের চেয়ারম্যান' এবং 'র-মেটিরিয়াল ল্যাবরেটরীর অধিকর্তা' নিযুক্ত করেন। এর ফলেই ভূ-রসায়ন নামে বিজ্ঞানের এক নতুন শাখার জন্ম হয়।

বিভিন্ন রাসায়নিক মৌলগুলি পৃথিবীর কোথায় কোথায়, কত পরিমাণে এবং কি অবস্থায় ছড়িয়ে আছে এ সম্বন্ধীয় সূত্র ও নিয়মাবলী তাঁরই আবিষ্কার। তাছাড়া ভূ-রসায়ন গবেষণায় রজন রশ্মি, মাস স্পেকট্রোমিটার প্রভৃতি আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার তাঁর পরিকল্পনামত করা হয়। ভূ-রসায়নের সাথে সাথে ক্রিস্টাল বা স্ফটিক রসায়ন গবেষণাগার প্রবর্তনও তিনি করেন। পৃথিবী গ্যাসীয় অবস্থা থেকে ঠাণ্ডা হয়ে তরল



অবস্থায় যাবার সময় গ্যাস ও তরল এই দুটি দশার বিভিন্ন মৌলগুলি কিভাবে ও কতটা পরিমাণে সঞ্চিত ছিল এবং তরল থেকে স্ফটিকাকারে রূপান্তরিত হবার পরই বা কি পরিমাণে তারা বিভিন্ন স্তরে সঞ্চিত ছিল, এই দুটি তথ্য সঠিকভাবে জানা তখন ভূতাত্ত্বিকদের কাছে ছিল বড় রকমের সমস্যা। গোল্ডস্মিথ মৌলগুলিকে চারটি ভাগে ভাগ করলেন। যে মৌলগুলি গলিত জোহার সঙ্গে মিশে ছিল তাদের বলা হল সিডারোফাইল, যেগুলি গলিত সালফাইড স্তরে ছিল তাদের ক্যালকোফাইল, সিলিকেট স্তরে মিশ্রিত মৌলদের লিথোফাইল এবং যে সব মৌল আদিকাল থেকে বাতাসে মিশে আছে তাদের বলা হল অ্যাটমোফাইল। তিনি বললেন, অক্সিজেন ও গন্ধকের প্রতি মৌলগুলির চাহিদা অনুযায়ী তারা বিভিন্ন স্তরে জমা হবে। যেমন, ভূত্বকে সোনা, রূপা, প্লাটিনাম, নিকেল, কোবাল্ট, জার্মেনিয়াম প্রভৃতি মৌল পাওয়া যাবে না, তাদের পাওয়া যাবে গলিত লোহার সঙ্গে সিডেরোফিল্যারে। সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম, টাইটেনিয়াম প্রভৃতি মৌল পাওয়া যাবে সিলিকেট স্তরে। বিভিন্ন খাত নিষ্কাশনের সময় তাঁর এই তত্ত্ব প্রমাণিত হয়েছে।

গোল্ডস্মিথ প্রমাণ করেন স্ফটিকীকরণের সময় যে সব মৌলের পরমাণু অথবা আয়ন স্ফটিকের ল্যাটিস বা জার্মার মধ্যে থাকে থাকে বসে যাবে তারাই স্ফটিকের মধ্যে থাকবে, জার্মার আয়তনের থেকে এদের আয়তন ছোট বা বড় হলে তারা তরলের মধ্যেই থেকে যাবে। এইভাবে স্ফটিকের গঠন ও তার রাসায়নিক উপাদানের মধ্যে সঠিক সম্পর্ক তিনি স্থাপন করেন। এরপর রজনরক্ষির সাহায্যে মৌলের পরমাণু ও আয়নের আয়তন বার করে কোন খনিজ, পাথর বা আকরিকে কোন বিশেষ মৌল পাওয়া যাবে তার ভবিষ্যৎ-বাণী করতে তিনি সক্ষম হন। তাঁর বিশাল কর্মকাণ্ড 'মৌলের ভূরাসায়নিক বণ্টনসংক্রান্ত নিয়মাবলী, (জিওকেমিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন ল'জ অফ এলিমেন্টস) নামে ন'টি খণ্ডের বইএ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে গোল্ডস্মিথই ভূরসায়ন ও স্ফটিক রসায়নের ভিত্তি স্থাপন করেন। স্ফটিকের কাঠিন্যের তারতম্যের কারণও তিনি আবিষ্কার করেন। এর ফলে বিশেষ প্রয়োজনে, বিশেষ ধরনের কাজের জন্য ইচ্ছামত স্ফটিক তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে এই কাজের অবদান অপরিমিত। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে মাটি ও পাথর এমন কি উজ্জাপিন্ড পর্যন্ত সংগ্রহ করে তিনি গবেষণা করেন। কোথাও কোনও মৌল শতকরা ০.০১ ভাগের কম থাকলেও তিনি তা নিভুলভাবে বলে দিতে পারতেন।

গোল্ডস্মিথের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং আনন্দময়

সময় ১৯২৯ সালে, যখন তিনি জার্মানীর গ্যাটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি সদস্য মনোনীত হন। তিনি ইহুদী বলে অনেকে এতে আপত্তি করলেও প্রাশিয়ান মন্ত্রিসভার শিক্ষা দপ্তর সে কথা মানেন নি। সেই সময় গ্যাটিংগেনে বহু দেশী ও বিদেশী বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের সমাবেশ ঘটছিল। এদের মধ্যে পদার্থবিদ, রাসায়নিক, জীববিজ্ঞানী, অঙ্ক-বিশারদ প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার লোক ছিলেন। এঁদের সঙ্গে আলোচনা ও সুযোগ্য সহকর্মী ও ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতায় এখানে তাঁর গবেষণা অনেক বেশি ফলপ্রসূ হয়েছিল। কিন্তু ১৯৩৩ সালে তাঁর কাজে বাধা আসে। ঐ সময় নাৎসীবাহিনী সুপারিকম্পিতভাবে গ্যাটিংগেনে এক জার্মানীর অন্য সব বিজ্ঞান ও কলাকেন্দ্র ধ্বংস করতে আরম্ভ করে। তাঁর অনেক ঘনিষ্ঠ ছাত্র ও সহকর্মী গ্যাটিংগেন ছেড়ে চলে যাওয়ায় গোল্ডস্মিথ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। কিন্তু তিনি গবেষণার কাজে নিজেই সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখেন। চিঠিপত্রের মাধ্যমে বহু ও সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। নিজে কোনও বিশেষ ধর্মে বিশ্বাসী না হলেও এই সময় তিনি স্থানীয় ইহুদী সমাজে যোগ দিতে বাধ্য হন। রাজনীতি ও জাতিগত সমস্যার জন্য পদচ্যুত হয়েছেন এমন বহু বিজ্ঞানীকে সাহায্য করে তিনি তাঁদের জীবন ও ভবিষ্যৎ রক্ষা করেন। নাৎসীদের অত্যাচারে ১৯৩৫ সালে তিনি গ্যাটিংগেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। প্রায় নিঃশব্দ অবস্থায় মাত্র আট মার্চ (তখনকার প্রায় বত্রিশ টাকা) সঙ্গে নিয়ে তিনি জার্মানী ত্যাগ করে নরওয়েতে আসেন। নরওয়ে সরকার তাঁকে সাদরে নরওয়ের নাগরিকত্ব এবং অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরানো পদ ফিরিয়ে দেন। একটি ছোট বাড়ির চিলেকোঠায় থেকে তাঁর সমস্ত অর্থ গবেষণার কাজে ও জার্মানী থেকে বিতাড়িত উদ্ভাবনদের প্রয়োজনে ব্যয় করেন। এই সময় তাঁর বই-এর নবম খণ্ডটি সমাপ্ত হয়। তিনি ভূ-রসায়ন ও মহাজাগতিক রাসায়নিক কণা নিয়ে গবেষণা শুরু করেন এবং আইসোটোপ ভূবিদ্যা নামে ভূবিদ্যার এক নতুন শাখার প্রবর্তন করেন। একই সঙ্গে তিনি চুল্লী তৈরির জন্য বিশেষ পদ্ধতি আবিষ্কার করে নরওয়ের শিপ্পোমারিতের চেষ্টাও চালিয়ে যান। এই সময় তাঁর পিতার মৃত্যু হওয়ায় তিনি একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। একাকিত্ব ও জার্মানীতে পড়ে থাকা বন্ধুবান্ধব ও ছাত্রদের জন্য উদ্বেগ, এই দুইই মিলে তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে দেয়।

এই সময় জার্মানী নরওয়েতে অধিকার বিস্তার করে এবং গোল্ডস্মিথকে গ্রেপ্তার করে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠায়। ইহুদী হওয়ার অপরাধে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং গ্যাস চেম্বারে হত্যা করার জন্য পোলাও পাঠানোর সিদ্ধান্ত

নেওয়া হয়। পথে নরওয়ে পুলিশবাহিনীর সহায়তায়, খড়ের গাড়িতে তিনি সুইডেনে পালিয়ে যান। 1943-এর বসন্তকালে তাঁকে ইংল্যান্ড ও পরে স্কটল্যান্ডে পাঠান হয়। ভাঙা স্বাস্থ্য সত্ত্বেও তিনি এখানে আবার মস্তি ও শক্তির স্বাদ ফিরে পান এবং স্কটল্যান্ড ও পরে ইংল্যান্ডে কৃষিগবেষণা পরিষদের অধীনে মস্তিকা গবেষণায় তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেন। এখানকার কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর ডঃ অগ ও তাঁর সহকর্মীদের সহযোগিতায় তিনি তাঁর শেষ এবং সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত বই 'ভূ-রসায়ন' লিখতে আরম্ভ করেন। 700 পাতার মত লেখাও হয়। কিন্তু ভাঙা স্বাস্থ্যের জন্য তিনি এই বই শেষ করে যেতে পারেন নি। তাঁর এই বই জিওকেমিস্ট্রি, তাঁর মৃত্যুর পর ডঃ আলেক্স মুর ও তাঁর অন্যান্য সহকর্মীদের অক্লান্ত চেষ্টায় 1954-এ প্রকাশিত হয়।

হল, কিন্তু রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হল না। কিছুদিন পরপরই অপারেশন করতে হতে থাকল। এর মাঝেই তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কাজে গবেষণা, বই ও পেপার রচনা এবং বন্ধু-বান্ধবদের চিঠি লেখা প্রভৃতি চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৯৪৭ এর মার্চ মাসে ষষ্ঠবার অপারেশনের জন্য তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন। অপারেশন ভালভাবেই হল। ২০শে মার্চ ভোরবেলা সুস্থ হয়ে তিনি বাড়ি ফিরলেন। বাড়ি ফিরে হঠাৎ তাঁর মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা শুরু হয় এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মাঠ উনষাট বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান হয়।

হেলেন বেলার গল্প

জ্যালবার্ট আইনস্টাইন

আমাদের মনে বন্ধ ধ্যানধারণার সঙ্গে যখন
কতর সংঘাত ঘটে, তখনই আমরা রহস্য বোধ
আমার বয়স যখন ৪।৫ বছর, তখন এই
রহস্য আমি অনুভব করেছিলুম। আমার
তখন আমাকে একটা নৌ-কম্পাস দিয়েছিলেন।
সের মণোকার কাঁটাটা সব সময় একটা নির্দিষ্ট
মুখ করে থাকে এই ব্যাপারটা আমাদের
ধ্যানধারণার সঙ্গে মেলে না। এই ঘটনা
মনে একটা গভীর ও স্থায়ী প্রভাব বিস্তার
কল। এই ঘটনার পেছনে কিছ একটা রহস্য
। মানুষ তার শিশুকালে যেসব জিনিস দেখে
মনে এই ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না।
আমার বয়স যখন ১২ বছর, তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন
আমার এক 'বিশ্বায়' আমি অনুভব করেছিলুম।



তখন আমার স্কুল জীবনে ইউক্লিডীয় জ্যামিতি
সম্পর্কিত একটি ছোট বই আমার হাতে এসেছিল।
তাতে একটা উপপাদ্য ছিল—একটি ত্রিকোণের
তিনটি উচ্চতা একটি বিন্দুতে ছেদ করে। যদিও এই
বক্তব্য প্রত্যক্ষীভূত নয়, তবু এটা এমন সুনিশ্চিত
ভাবে প্রমাণ করা যায় যে, এ সম্পর্কে কোনো
সংশয়ের প্রশ্নই ওঠে না। এই প্রাঞ্জলতা ও
নিশ্চয়তা আমার মনে এক অনির্বচনীয় প্রভাব
বিস্তার করেছিল। এটা প্রমাণ না করে যে স্বতঃ-
সিদ্ধ বলে ধরা হয়, তাতে আমি সন্দিহান হই নি।
যদি এই উপপাদ্যের প্রমাণ আমি খাড়া করতে
পারি, সেটাই হবে আমার পক্ষে যথেষ্ট। এই
প্রমাণ গ্রাহ্য হবে কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ
জাগে নি। জ্যামিতির বইটি আমার হাতে আসবার
আগে আমার এক কাকা পিথাগোরীয়ান উপপাদ্যের
বিষয় আমাকে বলেছিলেন। অনেক চেষ্টার পর
ত্রিকোণের অভিন্নতার ভিত্তিতে আমি এই উপপাদ্যটি
প্রমাণ করেছিলুম। একটা করতে গিয়ে আমার
মনে হয়েছিল, সমকোণী ত্রিকোণের বাহুগুলির সম্পর্ক
যে একটি সূক্ষ্মকোণের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নির্ধারিত
হতে পারে তা ধরেই নেওয়া যায়। যে বিষয়টি
অনুরূপভাবে আমার কাছে 'প্রতীয়মান' বলে মনে
হয়নি সেটা হচ্ছে কোনো প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা
আছে কিনা। যেসব জিনিস নিয়ে জ্যামিতির
কারবার, তার সঙ্গে ইঙ্গিয়গ্রাহ্য বস্তুর যা দেখা বা
সম্পর্ক করা যায়, কোনো তফাৎ নেই। এইভাবে
যদি ভাবা হয়, বিশুদ্ধ চিন্তার সাহায্যে অভিজ্ঞতার
বস্তু সম্পর্কে কিছু জ্ঞান সঞ্চয় করা সম্ভব, তাহলে
সেটা হবে ভুল। তা সত্ত্বেও এই অভিজ্ঞতা যার
প্রথম হয়, তার কাছে এটা যথেষ্ট বিশ্বাসকর বলে
মনে হয় যে, বিশুদ্ধ চিন্তার মানুষ এমন উচ্চ স্তরে
উপনীত হতে পারে। যেমন জ্যামিতিতে এটা
সম্ভব বলে গ্রীকরা আমাদের প্রথম দেখিয়েছিলেন।

আত্মজীবনী : আইনস্টাইন

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

অসীমা চট্টোপাধ্যায়

বাংলা তথা ভারতের কৃতী সন্তান আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

প্রথম দেখা 1936 সালে, আমি তখন বিজ্ঞান কলেজে রসায়ন শাস্ত্রের পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী। সেই সময় প্রায় আট বছর তাঁকে নানারূপে দেখেছি—কখনও শিক্ষক-রূপে, কখনও দেশপ্রেমিক রূপে, কখনও সাহিত্যসেবী রূপে, আবার কখনও পরম আত্মীয়রূপে।

তাঁর রচিত 'আত্মজীবনী' থেকে আমরা জানতে পারি—যশোর জেলার রাড়ুলি কাটিপাড়া গ্রামে 1861 সালের 2 আগস্ট তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা হরিশচন্দ্র রায় মাতা ভুবন মোহিনী দেবী। তাঁর বিদ্যাশিক্ষা পিতার প্রতিষ্ঠিত গ্রাম্য 'স্কুলেই' আরম্ভ হয়। তিনি দূরন্ত ছেলে ছিলেন। পাঠশালা থেকে পালিয়ে গাছে উঠে লুকিয়ে থাকতেন। পিতা শাসন করতেন না। শিক্ষকেরা অভিযোগ করলে বলতেন—'ঘাড়ে কেতাবের চাপ পড়লে দম ফেলবার ফুরসৎ পাবে না। তখন দেখো ফুণু (প্রফুল্লচন্দ্রের ডাকনাম) আমার ঠাণ্ডা ছেলে হবে।' (আত্মজীবনী)

ছেলেদের শিক্ষার জন্য 1870 সালে হরিশচন্দ্র কলকাতায় এসে আমহাস্ট' স্ট্রীটে একটি বাড়ি ভাড়া করেন। 1871 সালে প্রফুল্লচন্দ্র হেয়ার স্কুলে ভর্তি হলেন। এই সময় তাঁর পড়ার দিকে খুব ঝোক হয়। শেষ রাত্রে তিনটে চারটেয় উঠে পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বহু বই পড়তেন। চতুর্থ শ্রেণীতে পাঠকালে তিনি গুরুতর রক্ত আমাশয় আক্রান্ত হন। ফলে স্কুলের পড়া ছেড়ে দু'বছর তিনি বাড়িতে বসে থাকতে বাধ্য হন। এই সময় তিনি বাড়ির গ্রন্থাগারে বিজ্ঞানচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাল্মীকি ও তাঁহার যুগ', রামদাস সেনের 'কালিদাসের যুগ' ইত্যাদি গ্রন্থ পড়েন। এর ফলে তাঁর মন পুরাতত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং সেই আকর্ষণই পরবর্তীকালে তাঁকে তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ 'হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের ইতিহাস' রচনায় প্রবৃত্ত করে। এই স্কুল কামাইয়ের সময়ে তিনি ল্যাটিন ও ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেন।

দু'বছর পরে নিরাময় হয়ে 1874 সালে তিনি আলবার্ট স্কুলে ভর্তি হন। স্কুলের ক্লাস আরম্ভ হবার প্রায় এক ঘণ্টা আগে গিয়ে আলবার্ট হলে নিয়মিতভাবে ইংরাজি ও বাংলা দৈনিকপত্রগুলি পড়তেন।



আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

ছেলেবেলা থেকেই প্রফুল্লচন্দ্র গ্রামকে ভালবাসতেন। স্কুলে দীর্ঘকালীন ছুটি হলেই তিনি বাড়ুলিতে গিয়ে পল্লী-জীবন যাপন করতেন। শহরের জীবন তাঁর কাছে বন্দীর জীবন মনে হত। খোলা মাঠ, ভরা নদী, মুক্ত নীল আকাশ তাঁর বড়ই ভালো লাগত। বৃষ্টি বয়সে তিনি তাঁর 'আত্ম-জীবনী'-তে লিখেছেন, শৈশব স্মৃতিভরা তাঁর পল্লী গ্রামে গিয়ে তিনি যে আনন্দ পেতেন তার সঙ্গে শহরের জীবনের তুলনাই হয় না।

গ্রামে গিয়ে তিনি গরীব চাষী, প্রতিবেশীদের বাড়ি যেতেন এবং তাদের সুখ-দুঃখের খবর নিতেন। কেউ অসুস্থ থাকলে তাকে বাড়ি থেকে সাগু বার্লি দুধ মিহরি ইত্যাদি রোগীর পথ্য দিয়ে আসতেন। ছেলেবেলা থেকেই তিনি সাধারণ মানুষকে ভালবাসতেন। তাই পারিণত বয়সে তিনি অমন মানবদয়দী মহাপুরুষ হতে পেরেছিলেন।

বীজ থেকে গাছ উৎপন্ন করা এবং চাষ করে শস্য উৎপাদন করার প্রতি তাঁর খুব উৎসাহ ছিল। ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে নিজের হাতে মাটি খুঁড়ে সার দিয়ে বীজ বুনে তিনি চাষীদের মতো ফসল তৈরি করতেন।

এই রকম নানাবিধে তাঁর আকর্ষণ থাকায় এবং আনন্দ্যও খুব ভালো না থাকায় তিনি এণ্ট্রাস (বর্তমানের মাধ্যমিক) পরীক্ষার ভালো ফল করতে পারেন নি। দু বছর পরে

ম্যেট্রোপলিটান কলেজ (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) থেকে এফ. এ. পরীক্ষাও দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেন। তারপর প্রেসিডেন্সি কলেজ বিজ্ঞান নিয়ে 'বি এ' পড়েন। তাঁর পিতা হরিশ্চন্দ্রের ইচ্ছা ছিল তাঁকে বিলাতে পাঠিয়ে বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা দান করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি বাবসায়ের ক্ষতি ও লোকসানে বিপন্ন হয়ে পড়লেন, তার উপর প্রফুল্ল চন্দ্রের পরীক্ষার ফল আশানুরূপ না হওয়ায় তিনি সে আশা ত্যাগ করলেন। কিন্তু এই আঘাত ও নৈরাশ্য প্রফুল্লচন্দ্রকে নতুন করে উৎসাহিত করল নিজের সাধনায় নিজের পথ প্রস্তুত করে নিতে।

তখনকার দিনে বিলাতে একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পরীক্ষা হত, পরীক্ষাটিও ছিল বেশ কঠিন। প্রফুল্লচন্দ্র গোপনে কঠিন পরিশ্রমের সঙ্গে পড়াশোনা করে ঐ পরীক্ষায় পাস করেন 1882 সালে এবং তার দরুন গিনজাইস্ট বৃত্তি লাভ করেন। ঐ বৃত্তির টাকায় তাঁর পাথের এবং বিলাতে থাকা ও পড়ার খরচ সংকুলান হল। তাঁর অভিভাবকেরা মত দেওয়ায় প্রফুল্লচন্দ্র সাহসে ভর করে অবিলম্বে বিলাত যাত্রা করলেন।

1882 সালের অক্টোবরে প্রফুল্লচন্দ্র এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এস. সি ক্লাশে ভর্তি হন। তাঁর পড়ার বিষয় ছিল রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা এবং অতিরিক্ত বিষয় ছিল উদ্ভিদ বিদ্যা।

এডিনবরায় বি. এস সি পড়বার সময় 'সিপাহী যুদ্ধের আগে ও পার ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে একটি প্রান্ত যোগিতা-মূলক প্রবন্ধ লিখে তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে খ্যাতি অর্জন করেন। 1885 সালে তিনি বি. এস সি পরীক্ষা পাশ করেন। এবং গবেষণামূলক রাসায়নিক প্রবন্ধ লিখে 1887 সালে ডি এস সি উপাধি অর্জন করেন।

1888 সালে প্রফুল্লচন্দ্র স্বদেশে ফিরে আসেন। যখন কলকাতায় এসে পৌঁছলেন তখন একেবারে নিঃসম্মল। দেশে ফিরে প্রথমেই বন্ধুদের কাছ থেকে ধুতিচাদর খার করে নিয়ে বিদেশী পোশাক ছেড়ে দেশের বাড়িতে পিতা মাতার কাছে চলে যান।

এদেশে ফিরে অনেক চেষ্টার পর প্রেসিডেন্সি কলেজে সহকারী রসায়ন-অধ্যাপকের চাকরি পেলেন বেতন মাসিক 250 টাকা। এত অল্প বেতনে চাকরি করা তাঁর পক্ষে সম্মানজনক ছিল না। তবু অধ্যাপনা এবং ল্যাবরেটরীতে গবেষণা করার সুবিধা ও সম্ভাবনা থাকায় তিনি সে সুযোগ ত্যাগ করলেন না। শিক্ষাদানের সুযোগ লাভ তাঁর চোখে অন্যান্য স্বার্থ ও সম্মানের তুলনায় অনেক বেশি মূল্যবান মনে

হয়েছিল। 1889 সালের পরলা জুন আটশ বছর বয়সে তিনি অধ্যাপকের পদে যোগদান করেন। এখানে তাঁর ছাত্র ছিলেন মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ (যাঁরা পরবর্তীকালে খ্যাতনামা বিজ্ঞানী হয়েছিলেন)।

হেয়ার স্কুলে ভর্তি হবার পর যে ঘরে তিনি বসতেন সেই ঘরেই তাঁর রসায়ন বিভাগের ক্লাশ হলো এবং সেখানে তাঁর বসবার যে বেঞ্চটি ছিল সেইখানেই তাঁর অধ্যাপকের চেয়ার পাতা হলো। অল্পকালের মধ্যেই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলকাতার একজন খ্যাতনামা ও জনপ্রিয় অধ্যাপক বলে প্রসিদ্ধি লাভ করলেন। অন্যান্য কলেজ থেকেও ছাত্ররা তাঁর বস্তুত শুনতে আসত।

কলেজে ছুটি হবার পরও তিনি ল্যাবরেটরীতে নিজস্ব গবেষণার ব্যাপৃত থাকতেন। ল্যাবরেটরীই ছিল তাঁর বিশ্রামাগার ও চিন্তাবিনোদনের স্থান। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও গবেষণাই ছিল তাঁর অবকাশরঞ্জনের অবলম্বন। তাঁর উগ্ৰাম ও উৎসাহে এবং গবেষণার খ্যাতিতে প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়ন বিভাগ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ কার। বাঙালীর খাদ্যদ্রব্যে নানাবিধ ভেজালের প্রতি তাঁর দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়। ঘি, সরিষার তেল ইত্যাদির ওপর তাঁর গবেষণালব্ধ নবক এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল-এর পত্রিকায় 1894 সালে প্রকাশিত হয়। 1896 সালে তিনি 'মারকিউরাস নাইট্রাইট' আবিষ্কার কার বিজ্ঞানজগতে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর এই আবিষ্কার এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় ঐ সালেই প্রকাশিত হয়। 1902 সালে, তাঁর রচিত 'হিন্দুরসায়নের ইতিহাস' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় এবং তিনি সর্বত্র অভিনন্দিত হন। 1900 সালে তিনি বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠা করেন। 1916 সালে সার আশুতোষের আহ্বানে তিনি প্রেসিডেন্সি কালজ ছেড়ে নবগঠিত বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজে রসায়ন বিভাগে পালিত অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। কুড়ি বছর বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনার পর আচার্যদেব 1936 সালে অবসর গ্রহণ করেন। 1924 সালে তিনি ভারতীয় রসায়ন সমিতি (ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি) প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ছিলেন। বিজ্ঞান কলেজের দোতলায় দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের একটি ঘরে তিনি থাকতেন। তাঁর জীবন শুধু বিজ্ঞানের পঠন পাঠন ও গবেষণায় আবদ্ধ ছিল না। বন্যা, দূর্ভিক্ষ ইত্যাদি সংকটের সময় বিজ্ঞান কলেজে তাঁর বাস-কক্ষটি সমাজসেবীদের কর্মশালার পরিণত হত। এই কক্ষেই 1944 সালের 16 জুন তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ছেলেবেলার গল্প

গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য

‘ছেলেবেলার অনেক ঘটনার কথাই ভুলে গেছি। তবে কোন কোন ঘটনার অনেক কিছু স্মৃতিই রয়ে গেছে—কতক ঝাপসা, কতক পরিষ্কার। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী মনে পড়ে যোগেন মাস্টারের কথা। মাঝে মাঝে যোগেন মাস্টার ছেলেদের ডেকে এনে

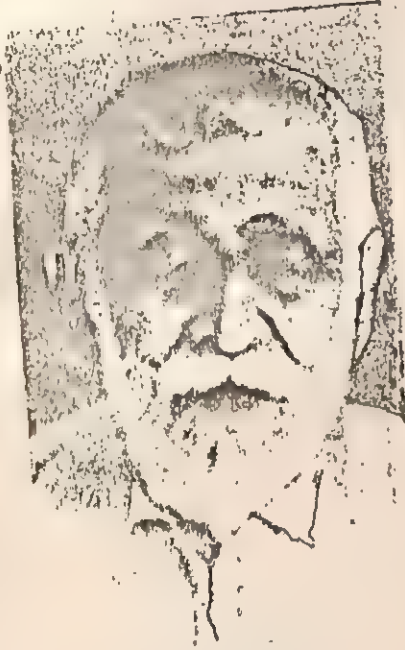
ম্যাজিকের খেলা দেখাতেন। একটা মজার-জিনিস দেখাবেন বলে একদিন তিনি ক্লাসরুমে মাস্টার, ছাত্র সবাইকে ডেকে নিয়ে এলেন। পকেট থেকে গাঢ় খয়েরী রঙের কতকগুলি বিচি বের করে মাস্টারদের হাতে দিয়ে বললেন—দেখুন তো জিনিসটা কি এবং এতে কোন ছিদ্র বা টুটা-কাটা আছে? দেখতে কতকটা কাঁই বিচির মত মনে হলেও আসলে তা নয়, কোন একটা অজানা ফলের বিচি—মসৃণ ও গোলাকার, কোথাও কোন টুটা-কাটা নেই। বিচি-গুলি টেবিলের উপরে রাখার কয়েক মিনিট পরেই একটা বিচি হঠাৎ প্রায় চার ইঞ্চি উঁচুতে লাফিয়ে উঠলো। তারপর এদিক-ওদিক থেকে প্রায় সব-গুলি বিচিই থেকে থেকে লাকাতে শুরু করে দিল। অবাক কাণ্ড! কিভাবে এটা সম্ভব হতে পারে? আমরা তো ছেলেমানুষ, বড়রাই কিছু বুঝে উঠতে পারেন নি। অবশেষে মাস্টারমশাই ছুরি দিয়ে একটা বিচি চিরে কেলতেই দেখা গেল, তার ভিতরে রয়েছে একটা পোকা (Larva)। টেবিলের উপর পড়েই পোকাটা ধনুকের মত শরীরটাকে বাঁকিয়ে ছুপ্রান্ত একত্রিত করে অদ্ভুত ভঙ্গিতে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো।

এই ঘটনা থেকেই কীটপতঙ্গ, পোকামাকড় সম্বন্ধে একটা কোঁতূহল জাগতে লাগলো। নতুন কোন পোকা-মাকড় বা গাছপালার বৈশিষ্ট্য নজরে পড়লে বিষয় জাগতো বটে, কিন্তু সুসংবদ্ধ জ্ঞানের অভাবে তার প্রকৃত রহস্য উপলব্ধি করবার ক্ষমতা ছিল না। অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি, আনাড়ি হাতেই একটা টাইমপীস খুলে বালালুম্ভাইলটার অদ্ভুত ক্ষুণ্ণগতি এবং অস্বাভাবিক (আপাততঃ নিষ্ক্রিয়তা) দেখে অবাক হয়ে ভাবতাম—কেমন করে এটা সম্ভব হচ্ছে?

‘মনে পড়ে’: গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য



নক্ষত্র বিজ্ঞানী রাধাগোবিন্দ



রবীন বসু

দুর্নিবার কৌতূহল, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের গুণে যে কয়েকজন বাঙালি বিজ্ঞানী বিশ্বের দরবারে খ্যাতি ও স্বীকৃতি লাভ করেছেন রাধাগোবিন্দ চন্দ্রের নাম তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাধাগোবিন্দ চন্দ্র আমাদের দেশে সমসাময়িককালে হয়তো ততটা খ্যাতি ও পরিচিতি লাভ করতে পারেন নি। কিন্তু আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানের দরবারে তিনি পেয়েছিলেন স্বীকৃতি ও সম্মান। জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় তাঁর গবেষণা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নানা প্রবন্ধ সেকালের বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

অথচ এই পল্লী নক্ষত্রবিদের আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না, ছিল না বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উচ্চ ডিগ্রী। ফলে আধুনিক গবেষণাগারের সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহারের কোন সুযোগই তিনি পান নি।

আজ থেকে প্রায় 110 বছর আগে বাংলাদেশের যশোর

জেলায় রাধাগোবিন্দের জন্ম। বিদ্যালয়ের প্রথাগত পাঠাভ্যাস তাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। তবে নানাবিধের বই পড়ায় তাঁর ছিল ভীষণ আগ্রহ। বিশেষতঃ জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক বই। রাতের আকাশের উজ্জ্বল গ্রহ-নক্ষত্রের কিস্ময়কর চলাফেরা কিশোর রাধাগোবিন্দকে গভীরভাবে কৌতূহলী করে তুলেছিল। 1910 সালে হ্যালির ধূমকেতুকে একটি সাধারণ বাইনকুলারের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করে রাধাগোবিন্দ চন্দ্র একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বস্তুতঃ এই প্রবন্ধ রচনার সূত্র ধরেই নক্ষত্র পর্যবেক্ষণে তাঁর দৃঢ় পদক্ষেপের সূচনা হয়। বাংলায় বিজ্ঞান রচনায় অন্যতম পথিকৃৎ জগদানন্দ রায় রাধাগোবিন্দের প্রবন্ধটি পড়ে মুগ্ধ হন। এবং তিনি রাধাগোবিন্দকে একটি টেলিস্কোপ সংগ্রহ করে আকাশ পর্যবেক্ষণে উৎসাহিত করেন। সেই থেকেই শুরু।

তিনি লন্ডন থেকে সরাসরি একটি তিন ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট একটি টেলিস্কোপ সংগ্রহ করলেন। শুরু হল তার নক্ষত্র-গবেষণা।

রাতের পর রাত তিনি টেলিস্কোপে চোখ রেখে কাটাতে লাগলেন। এবং তার পর্যবেক্ষণ ও গবেষণালব্ধ তথ্য পাঠাতে লাগলেন দেশ-বিদেশে। বিজ্ঞান পত্র-পত্রিকায় সেগুলি প্রকাশিত হত। সামান্য একটি তিন ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট টেলিস্কোপের সাহায্যে তিনি আকাশের নানা জ্যোতিঃপদার্থই পর্যবেক্ষণ করেছেন। এবং তাঁর পর্যবেক্ষণ লব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে রচিত তাঁর প্রবন্ধাবলী পড়ে সেকালের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মুগ্ধ হয়ে যেতেন। তাঁর রচিত প্রবন্ধাবলী British Astronomical Association, Harvard College University, American Association of Variable star observers প্রমুখ প্রথম শ্রেণীর পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। রাধাগোবিন্দের গবেষণার স্বীকৃতি স্বরূপ লন্ডন, ফ্রান্স ও আমেরিকার জ্যোতির্বিজ্ঞান সংস্থাসমূহ তাঁকে মাননীয় সদস্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন। হার্ভার্ড মানমন্দির থেকে তাঁর গবেষণার কাজে সুবিধার জন্য তাঁকে উপহার দিয়েছেন একটি শক্তিশালী দূরবীন। ফ্রান্সের সরকারী শিক্ষাবিভাগও তাঁকে বিশেষ উপাধি ও রৌপ্যপদক অর্পণ করে সম্মানিত করেছিলেন।

রাধাগোবিন্দ আকাশের জ্যোতিঃপদার্থ নিয়ে গবেষণা করেছেন প্রায় 40 বছর। রাধাগোবিন্দ চন্দ্রের জীবন ও গবেষণার কথা উল্লেখ করে ডঃ জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য বলেছেন, 'বিজ্ঞানীমহলে স্বর্গীয় রাধাগোবিন্দ চন্দ্রের নাম খুব পরিচিত না হলেও নক্ষত্রবিজ্ঞানে তাঁর দান অতুলনীয়। রাধাগোবিন্দ চন্দ্র কোন বড় মান-মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, বড় টেলিস্কোপ এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারের

সুযোগ তান পান নি। তাঁর ছোট দরবান নিয়ে রাতের পর রাত পরিবর্তনশীল নক্ষত্রগুলির (Variable stars) স্বরূপ জ্ঞান লিপিবদ্ধ করতেন। এবং সংগৃহীত তথ্যগুলি বিশ্বের জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে পাঠাতেন। তাঁর পাঠানো ম্যাপগুলি এতই উচ্চমানের ছিল যে, আমেরিকার এক নক্ষত্রবিজ্ঞানী সংস্থা (AAVSO : American Associan of Variable Stars observers) চাঁদা তুলে তাঁর কাজের স্ববিধার জন্য একটি ৬ ইঞ্চি ব্যাসের টেলিস্কোপ তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। রাধাগোবিন্দ সেইটির উপযুক্ত ব্যবহার করে বহু পরিবর্তনশীল নক্ষত্রের স্বরূপ নিদারণ করেছিলেন।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই স্বভাববিজ্ঞানী নীরবে তাঁর সাধনা চালিয়ে গেছেন। অথচ পেশায় ছিলেন সামান্য করণিক। অদম্য কৌতূহল, বিজ্ঞান প্রবণতা ও কঠিন অধ্যবসায়ের ফলেই তিনি বিশ্বের বিজ্ঞানীমহলের শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি লাভ করেছেন। আমাদের দেশে পঞ্জিকা সংস্কার আন্দোলনেও রাধাগোবিন্দের দান বিশেষভাবে স্বীকৃত। ৭৭ বছর বয়সে ১৯৭৫ সালে পঞ্জী নক্ষত্রবিদ রাধাগোবিন্দ চন্দ্রের মৃত্যু হয়।

সংগ্রহসূত্র : রণতোষ চক্রবর্তী ও হৃদংশেখর সিন্হা
সম্পাদিত "ধ্রুবেকু" : রাধাগোবিন্দ চন্দ্র।
